ইউনিট-৮

খলজী ও তুঘলক বংশ

দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে খলজী ও তুঘলক বংশের শাসনকাল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।এই দুই বংশের শাসনকালই এই ইউনিটের বিষয়। খলজী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন খলজী, যিনি ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে এবং নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিম শাসন দৃঢ়ীকরণে অবদান রেখেছিলেন। প্রথম দুটি পাঠে খলজী যুগের ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

তুঘলক বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা, মুহাম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকাল নিয়ে রচিত হয়েছে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পাঠ। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে মুহাম্মদ বিন তুঘলক অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। বিভিন্ন সংস্কার সাধনের চেষ্টায় তিনি তাঁর প্রতিভার সাক্ষ্য রেখেছিলেন। তাঁর সংস্কারসমূহের পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে চতুর্থ পাঠে।

এই ইউনিটের শেষ পাঠে দিল্লি সালতানাতের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থার বিশ্লেষণ রয়েছে। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল তারই পরিচয় পাওয়া যাবে এই পাঠে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. আরবদের সিন্ধু বিজয়
- পাঠ-১. খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা ঃ আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ
- পাঠ-২. আলাউদ্দিন খলজীর সংস্কার
- পাঠ-৩. তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক
- পাঠ-৪. মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনা
- পাঠ-৫. ফিরোজ শাহ তুঘলক
- পাঠ-৬. সুলতানি আমলে উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থা।

পাঠ - ১

খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা: আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- খলজী বংশের উৎপত্তি ও খলজী বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন ;
- আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্যবাদী নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ;
- চিতোর অভিযান এবংপদ্মিনী উপাখ্যান মূল্যায়ন করতে পারবেন ;
- আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক কৃতিত্ব সম্পর্কে জানবেন।

খলজী বংশের উৎপত্তি

খলজী বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী বলেন, দিল্লিতে কাচান ও সুরখা'র নেতৃত্বে তুর্কি দল এবং জালালউদ্দিন খলজীর নেতৃত্বে খলজী দল পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। খলজীগণ ছিল তুর্কি জাতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। এর বেশি কোনো বর্ণনা বারাণী দেননি। পরবর্তী ঐতিহাসিক নিজামউদ্দিনের মতে, খলজীগণ ছিল চেঙ্গিস খাঁর জামাতা কুলিজ খাঁ'র বংশধর। কুলিজ খাঁ'র নামানুসারে তাঁর বংশধরগণ 'কালিজ' ও 'খালিজ' নামে পরিচিত হয়। নিজামউদ্দিনের এই মত সমর্থন করে ঐতিহাসিক ফিরিস্তা কালিজ খাঁকে খলজী বংশসম্ভূত এবং জালালউদ্দিন খলজীকে কুলিজ খাঁর বংশধর বলে অভিহিত করেন। যাহোক, গভীরভাবে বিচার করলে খলজীগণকে তুর্কি বংশসম্ভূত বলেই মনে হয়। আফগানিস্তানের হেলমন্দ নদীর উপকূল অঞ্চল 'খলজী অঞ্চল' এবং এখানকার অধিবাসীগণ 'খলজী' নামে পরিচিত।'তাবাকাৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থের রচয়িতা মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন যে, খলজীগণ ঘোর ও গজনী রাজবংশের অধীনে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিল। আধুনিককালের ঐতিহাসিক লেনপুল অনুমান করেন যে, খলজী বংশ তুর্কি জাতি হতে উদ্ভূত এবং দীর্ঘকাল আফগানিস্তানের গরম্শির নামক অঞ্চলে বসবাস করার ফলে তাঁদের মধ্যে আফগান জাতির বহু আচার-আচরণ, রীতি-নীতি প্রবেশ করে। মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ বারথোল্ড (Barthold)-এর মতে, খলজীগণ ছিল তুর্কি এবং এরা খ্রিস্টিয় চতুর্থ অব্দের পর আফগানিস্তানে বসতি স্থাপন করেন। মোটামুটিভাবে একথাটি বলা যেতে পারে যে, খলজীগণ অবশ্যই তুর্কি ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁরা গজনী ও ঘোরের আক্রমণকারীদের সাথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং অনেকে মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানে মোঙ্গল আক্রমণের সময় আশ্রয়ের সন্ধানে ভারতে আসে। কিন্তু ভারতে বহুদিন ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইলবারি তুর্কিগণ নবাগত খলজীগণকে কখনোই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, যদিও উভয়েই এক জাতি বা গোষ্ঠীভুক্ত ছিল।

খলজী বংশের উত্থান: জালালউদ্দিন খলজী

ইলবারি তুর্কি বংশের শেষ সুলতান কায়কোবাদকে হত্যা করে জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজী ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। খলজীদের উত্থান ভারতের ইতিহাসে 'খলজী বিপ্লব' (Khalji Revolution) নামে অভিহিত হয়েছে। জালালউদ্দিন খলজীর পূর্বপুরুষেরা তুর্কি জাতীয় লোক ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে তুর্কি অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে আক্রমণকারীদের সঙ্গে ভারতে তাঁদের আগমন ঘটে। শুরু থেকেই খলজীরা ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শাসনকার্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। জালালউদ্দিন খলজীর সাফল্যের মাধ্যমে তাঁদের ক্ষমতা উচ্চ শিখরে উপনীত হয়। খলজীদের এই

শক্তিবৃদ্ধিতে ইলবারি তুর্কিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। তুর্কিরা খলজীদেরকে অ-তুর্ক মনে করতো। এ কারণে জালালউদ্দিন খলজী শক্তিশালী তুর্কি ওমরাহ্গণের স্বত:প্রবৃত্ত আনুগত্য হতে বঞ্চিত হন। এমনকি কৈলুগড়ি প্রাসাদে অভিষেক হবার পরও তিনি অনেকদিন পর্যন্ত দিল্লিতে প্রবেশ করতে পারেননি। যাহোক, কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন। জায়গীর ও সরকারি চাকুরির বন্টনে সুলতান তাঁর পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন; অবশ্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তুর্কি আমীর-ওমরাহ্গণের মনোরঞ্জনের চেষ্টাও তিনি করেন। বলবন পরিবারের সদস্য এবং প্রবীন ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে সুলতান অনেকের আস্থা ও আনুগত্য লাভ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি 'বলবনের সিংহাসন-কক্ষের সামনে অশ্রু বিসর্জন করতেন' তিনি বলবনের পরিত্যক্ত বিশাল রাজ্য শাসনের যোগ্য কিনা সে বিষয়ে রাজ্যের নবীনেরা সন্দেহ পোষণ করতেন। জালালউদ্দিনের দুর্বলতাও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়। তিনি বিদ্রোহী বন্দিদের মুক্ত করে দেন, তাদেরকে পানসভায় আপ্যায়ন করেন; পরকালের চিন্তায় রক্তপাত থেকে বিরত থাকেন; গ্রেপ্তারকৃত সহস্রাধিক 'ঠগ' কে শাস্তি প্রদানে ব্যর্থ হন এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর সম্পর্কে জনগণের ধারণা হয় যে, তিনি ঈশ্বরের কৃপাধীন নন।

রণথম্ভোরের বিরুদ্ধে প্রেরিত এক অভিযানই (১২৯১ খ্রি:) ছিল সুলতানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রয়াস। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধেও জালালউদ্দিন কিছুটা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের এক বাহিনী সিন্ধু নদ অতিক্রম করে সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হলে সুলতান তাদেরকে পরাজিত করেন।

খলজী বিপ্লবের গুরুত্ব

ইলবারি তুর্কিদের বিরুদ্ধে খলজীদের সাফল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সময় হতে ইলবারি তুর্কিরা দিল্লিতে জেঁকে বসে। তারা নিজেদেরকে দিল্লির সিংহাসনের ধারক ও বাহক মনে করতো। তুর্কিরা মনে করতেন তাঁরাই একমাত্র অভিজাত শ্রেণী। অন্য কেউ তাঁদের আভিজাত্য ক্ষুন্ন করুক এটা তাঁরা সহ্য করতেন না। কিন্তু জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজীর সাফল্য এবং দিল্লির সিংহাসন অধিকার ইলবারি আভিজাত্যের ওপর চরম আঘাত হানে।এরপর থেকে খলজীদের সাথে অন্যান্য অ-তুর্ক মুসলমানদেরও ক্ষমতা লাভের পথ প্রশস্ত হয়। মাত্র ত্রিশ বছর স্থায়ী খলজী শাসন দিল্লি সাম্রাজ্যের মোড় পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়। সকল স্তরের, সকল গোত্রের মুসলমানদের সমন্বয়ে তাঁরা এমন শক্তি সঞ্চয় করেন, যাতে শুধু দিল্লি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধিই নয় বরং সুদূর দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত মুসলমান শাসনের সম্প্রসারণ ঘটে। খলজীগণ এটাই প্রতিপন্ন করেন যে, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমর্থন ছাড়াও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও শক্তি অক্ষুন্ন রাখা যায়। সর্বোপরি খলজীদের সাফল্য শুধু যে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটায় তা নয়, এটা ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতিরও সূত্রপাত করে। খলজীগণ কোন রাজপরিবারভুক্ত ছিলেন না– রাজত্বসূচক কোন ঐতিহ্যও তাঁদের ছিল না। তাঁরা ছিলেন সাধারণ শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং খলজীদের সাফল্যে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সার্বভৌম অধিকার কোনো বিশেষ শ্রেণীর একচেটিয়া নয়।

আলাউদ্দিন খলজী: প্রথম জীবন

সিংহাসনে আরোহণের পর জালালউদ্দিন খলজী তাঁর প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা 'আলি ঘুরশাস্প' কে 'আমীর-ই-তুজুক' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এই আলিই হলেন শ্রেষ্ঠ খলজী শাসক আলাউদ্দিন খলজী।সুলতানি সাম্রাজ্যের একজন বিখ্যাত সুলতান হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে। আলাউদ্দিনের বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত ১২৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় বিদ্যাশিক্ষার কোনো সুযোগ তাঁর হয়নি। কিন্তু তরুণ বয়সে তাঁকে অশ্বচালনা ও অসিচালনায় বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয়। তখন তিনি সামরিক নৈপুন্যের পরিচয়ও দেন। ১২৯১ সালে বলবনের ভ্রাতুস্পুত্র মালিক চজু (মতান্তরে ছজ্জু) বিদ্রোহী হলে তিনি তাঁকে দমন করেন। এই কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ আলাউদ্দিনকে এলাহাবাদের নিকটবর্তী কারা-মানিকপুরের জায়গীর দেয়া হয়। এরপর থেকেই

আলাউদ্দিনের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ প্রকাশ পেতে শুরু করে। মালিক চজুর অনুচরদের প্ররোচণায় এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক ও পারিবারিক পরিস্থিতিতে তিনি স্বাধীন ক্ষমতা লাভের সংকল্প করেন। কিন্তু এই উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। আলাউদ্দিন নিজের অনুচরদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হন। বহু সেনা ও আমীর-ওমরাহ্ তাঁর দলভুক্ত হয়। এরপর অর্থ সংগ্রহে তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন ভিলসা নগর আক্রমণ করে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। ভিলসায় তিনি দেবগিরির যাদব রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধির কথা শুনেছিলেন। বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে সেখানে আক্রমণের জন্য তিনি সংকল্প করেন। ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা করেন। আলাউদ্দিনের সাথে ৮ হাজার অশ্বারোহী ছিল। দেবগিরিতে তিনি সাফল্য লাভ করেন। বহু অশ্ব ও হস্তি তাঁর হস্তগত হয়। যাদবরাজ রামচন্দ্র সন্ধি করেন এবং আলাউদ্দিনকে বিপুল পরিমাণে স্বর্ণ ও রত্নাদি প্রদানে রাজি হন। আলাউদ্দিনের দেবগিরি অভিযানের রয়েছে বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব। কেননা, বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এটাই হলো মুসলমানদের প্রথম অভিযান। এ সময় হতেই দাক্ষিণাত্যে মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সূত্রপাত হয়। তদুপরি এ অভিযানে আলাউদ্দিন তাঁর রণ নৈপুন্য ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন।

আলাউদ্দিনের সিংহাসনারোহণ

ধনসম্পদ নিয়ে আলাউদ্দিন কারায় ফিরে আসেন। কারায় তাঁর অনুপস্থিতিকালে সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারীরা সুলতানকে আলাউদ্দিন সম্পর্কে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, উচ্চাভিলাষী আলাউদ্দিনকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু সুলতান এ প্রচারণায় কান দেননি।আলাউদ্দিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উলুঘ খাঁ দিল্লিতে আলাউদ্দিনের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তিনি সুলতানকে আলাউদ্দিনের প্রতি বিশ্বস্ত রাখতে তৎপর ছিলেন।এমনকি উলুঘ খাঁর পরামর্শ মতো সুলতান জালালউদ্দিন খলজী আলাউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।বলা হয়ে থাকে, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার সাহায্যে পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী আলাউদ্দিনের ইঙ্গিতে দুজন দুর্বৃত্ত জালালউদ্দিনকে হত্যা করে।নিহত সুলতানের মস্তক একটি বর্শাফলকে বিদ্ধ করে শাসনাধীন অঞ্চলে প্রদর্শন করা হয় বলেও সমসাময়িক সূত্র থেকে জানা যায়। তবে অনেকে মনে করেন, সুলতানের হত্যাকান্ড আলাউদ্দিনের পূর্বপরিকল্পনাপ্রসূত নয়। পরিস্থিতির বাস্তবতায় তাৎক্ষণিকভাবেই এটি ঘটেছে।যাহোক, এরূপেই ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে বসে তিনি জালালউদ্দিনের পুত্র আরকালী খাঁকে পরাজিত করে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। যে সকল আমীর-ওমরাহ্ অর্থলোভে আলাউদ্দিনের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন তাঁদেরকে তিনি কঠোর শাস্তি দেন।কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, অর্থলোভী ব্যক্তিরা যে কোন সময়ই প্রভু বদল বা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতি

আলাউদ্দিন যুদ্ধপ্রিয় ও সাম্রাজ্যবাদী সুলতান ছিলেন। সিংহাসনে বসেই তিন দিগ্বিজয় - নীতি গ্রহণ করেন। তিনি নতুন এক ধর্ম প্রবর্তনেরও উদ্যোগ নেন। যাহোক আলেকজান্ডারের মতো বিশ্বজয়ের বাসনার বাস্তবায়ন না হলেও আলাউদ্দিন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। সুতরাং, আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল উদ্দেশ্য হিসেবে সমগ্র ভারতে সার্বভৌম রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আলাউদ্দিন একের পর এক যুদ্ধ শুরু করেন। প্রথমেই তিনি মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করার দিকে মনোযোগ দেন। মোঙ্গলদের উপর্যুপরি আক্রমণের বিপরীতে ভারতের নিরাপত্তা বিধান সুলতান আলাউদ্দিনের রাজত্বের একটি অন্যতম কীর্তি। ইলতুৎমিশের আমল থেকে সুলতানি সাম্রাজ্যের সীমাকে বৃদ্ধি করার কোন চেষ্টা কোন সুলতান করেননি। আলাউদ্দিন খলজী শুরুতেই তার পিতৃব্য জালালউদ্দিনের রাজত্বকালে দেবগিরি লুণ্ঠন করে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় দেন। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করে পরিচালনা করেন– প্রথমে উত্তর ভারত এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ ভারত।

উত্তর ভারত অভিযান: গুজরাট

সিংহাসনে আরোহণের পর আলাউদ্দিন খলজীর প্রথম অভিযান ছিল গুজরাট অভিযান। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই অভিযান প্রেরণ করেন। গুজরাট ছিল খুবই সমৃদ্ধশালী অঞ্চল। বাঘেলা রাজপুত বংশীয় কর্ণদেব বা রায়করণ এ সময় গুজরাটের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলাউদ্দিন তাঁর দুই সেনাপতি নসরৎ খান ও উলুঘ খাঁকে গুজরাট জয়ের জন্য পাঠিয়ে দেন।রাজা কর্ণ আমেদাবাদের যুদ্ধে পরাজিত হন।রাণী কমলাদেবী সুলতানের সৈন্যদের হাতে বন্দি হন। অত:পর আলাউদ্দিন তাঁকে বিয়ে করেন। রাজা কর্ণ তাঁর কন্যা দেবলরানীসহ দক্ষিণে দেবগিরিতে পালিয়ে যান। আলাউদ্দিনের সৈন্যরা ক্যাম্বে বন্দর ও সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্নসহ দিল্লিতে ফিরে আসেন। ক্যাম্বেতে নসরৎ খান জনৈক খোজা মালিক কাফুরকে কিনেন এবং সুলতানকে উপহার দেন। পরে মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের প্রধান সেনাপতি হন।

রণথম্ভোর অভিযান

১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দিন রণথম্ভোর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আমীরদের সঙ্গে পরামর্শ করে যুদ্ধের সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খানের নেতৃত্বে বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। সেনাপতিদ্বয় রণথম্ভোর অবরোধ করেন। অবরোধ চলাকালে সেনাপতি নসরৎ খান অবরোধ কার্য পরিদর্শনের সময় হঠাৎ একটি গোলার আঘাতে আহত এবং কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রণথম্ভোরের রাজা রাণা হাম্মীর প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে উলুঘ খাঁ অনেক ক্ষতি স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করেন। এই সংবাদ দিল্লি পৌঁছলে সুলতান নিজে রণথম্ভোরের দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু পথে তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র আকাত খান তাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করেন।কয়েকজন অসন্তুষ্ট আমীরের প্ররোচণায় আকাত খান সুলতানকে হত্যা করে সিংহাসন দখলে অভিলাষী হন। সুলতান আহত হন যদিও তাঁর আঘাত গুরুতর ছিল না, আকাত খানকে তৎক্ষণাত হত্যা করা হয়।এছাড়াও সুলতানের বিরুদ্ধে অপর কয়েকটি বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। কিন্তু সুলতানের সতর্কতার নিকট সকলেই নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এসব বিপদ কেটে গেলে সুলতান সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রণথম্ভোর আক্রমণে মনোযোগ দেন। প্রায় এক বছর ধরে রণথম্ভোর দুর্গ অবরোধ করার পর দিল্লি বাহিনী দেওয়াল টপকিয়ে দুর্গ অধিকার করে। রাণা হাম্মীরকে পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করা হয়। যে সকল সৈন্য শেষ পর্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে যুদ্ধ করে, তাদেরও নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

চিতোর অভিযান

আলাউদ্দিন খলজীর অন্যতম বিখ্যাত অভিযান ছিল চিতোর আক্রমণ। তিনি ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজপুতনার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য মেবারের এই দুর্গ আক্রমণ করেন। চিতোর ছিল মেবার রাজ্যের রাজধানী। মেবারের রাজবংশ 'শিশোদিয়া বংশ' ছিল খুবই প্রাচীন ও সম্মানিত। চিতোরের রাণা রতন সিংহ আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে সুলতান চিতোর অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। কারণ, চিতোর দুর্গ বিরোধী শক্তির হাতে থাকলে সুলতানি সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিপন্ন হবার আশঙ্কা ছিল। সুতরাং চিতোরের ওপর দিল্লির আধিপত্য স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। চিতোর দুর্গটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ছিল। আলাউদ্দিন খলজী বহু চেষ্টা করে সম্মুখ যুদ্ধে দুর্গ দখল করতে বিফল হন। রাজপুতরা বীরবিক্রমে সুলতানি বাহিনীকে হঠিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দুর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলেন। প্রায় সাতমাস অতিবাহিত হওয়ার পর আর টিকতে না পেরে চিতোর রাজা রতনসিংহ আত্মসমর্পণ করেন। রতন সিংহ আত্মসমর্পণের পূর্বে রাজপুত রমণীরা অগ্নিকুন্ডে ঝাঁপ দিয়ে জহরব্রত পালন করে বলে কথিত আছে। প্রায় ত্রিশ হাজার রাজপুত সৈন্য নিহত হয়। কয়েকদিন চিতোর

থাকার পর পুত্র খিজির খানকে চিতোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান

আলাউদ্দিন খলজীর চিতোর আক্রমণকে কেন্দ্র করে একটি সুন্দর উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, রাজা রতন সিংহ-এর সুন্দরী রাণী পদ্মিনীকে পাবার উদ্দেশ্যেই সুলতান আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন; কিন্তু অনেক বিশ্বাসঘাতকতার পরও সুলতান পদ্মিনীকে তাঁর হারেমে আনতে সক্ষম হননি। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে মালিক মুহাম্মদ জয়সী নামক এক কবি সর্বপ্রথম "পদ্মিনী উপাখ্যান" রচনা করেন এবং এরপর পদ্মিনী উপাখ্যান লোক সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যদিও মুসলমান সুলতানদের হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করার নজির আছে, বিশেষ করে সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর হিন্দু রমণী বিয়ে করার প্রমাণও আছে, তথাপি পদ্মিনী-উপাখ্যানের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশও রয়েছে। সমসাময়িক কোন ইতিহাস গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। এমনকি আমীর খসরু, যিনি চিতোর অভিযানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, তিনিও পদ্মিনী- উপাখ্যানের উল্লেখ করেননি। আধুনিক কোন কোন পন্ডিত মনে করেন যে, পদ্মিনী উপাখ্যান একান্তই মালিক মুহাম্মদ জয়সীর কল্পনা-প্রসূত ভাবনার কাব্যিক রূপ মাত্র।

মালব জয়

চিতোর অধিকারের পর সুলতান আলাউদ্দিন মালব আক্রমণ করেন। মালবের রাজা অনেক যুদ্ধ করেও পরাজিত হন এবং আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। মালব জয়ের পর সুলতান সেখানে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এরপর সুলতান মান্ডু, উজ্জয়িনী এবং চান্দেরী ইত্যাদি এলাকা জয় করেন। এভাবে সমগ্র উত্তর ভারত সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর অধিকারে আসে।

দাক্ষিণাত্য অভিযান

উত্তর ভারত বিজিত হওয়ার পর সুলতান আলাউদ্দিন খলজী দাক্ষিণাত্য বিজয়ের দিকে মনোনিবেশ করেন। দাক্ষিণাত্যের ভৌগোলিক অবস্থান এবং দিল্লি হতে দূরত্ব-এই উভয় কারণে দাক্ষিণাত্য বিজয় মুসলমানদের জন্য একরূপ অসম্ভব ছিল। দক্ষিণে এই সময় চারটি হিন্দু রাজ্য ছিল, যেমন বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবগিরি রাজ্য; বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তেলেঙ্গনা বা বরঙ্গল রাজ্য অবস্থিত ছিল; কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে ছিল দ্বারসমুদ্র রাজ্য; সর্বদক্ষিণে ছিল পান্ড্যরাজ্য, এর রাজধানী ছিল মাদুরাই।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজী তাঁর প্রিয় ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে দাক্ষিণাত্য অভিযানে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান। দাক্ষিণাত্য যাওয়ার পথে মালিক কাফুর মালওয়া ও গুজরাট আক্রমণ করেন, বাঘেলারাজ করণকেও পরাজিত করেন।

দেবগিরি জয়

বিন্ধ্যের দক্ষিণে আলাউদ্দিন খলজীর বাহিনীর সফলতা ছিল বিস্ময়কর। ১৩০৬-৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরির রামচন্দ্রদেবকে পরাস্ত করে দেবলাদেবীকে বন্দি করেন। আলাউদ্দিনের পুত্র খিজির খানের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। রামচন্দ্রদেব দিল্লিতে এসে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রায়-রায়ান উপাধি পান। অত:পর তিনি দক্ষিণে সুলতানি অভিযানের প্রধান সাহায্যকারীতে পরিণত হন।

তেলেঙ্গানা জয়

দেবগিরি জয়ের পর মালিক কাফুর ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে তেলেঙ্গানা আক্রমণ করেন। দেবগিরির রামচন্দ্রদেব তাঁকে বহু রসদ দিয়ে সাহায্য করেন এবং তেলেঙ্গানা দুর্গে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দেন। রাজা প্রতাপরুদ্রদেব তেলেঙ্গানা দুর্গে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে কাফুরের সৈন্যবাহিনী দুর্গ অবরোধ করে। রাজা রুদ্রদেব দুর্গের ভিতর আশ্রয় নিয়ে বিপুল বিক্রমে কাফুরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। অনেকদিন অবরুদ্ধ থাকার পর কাকতীয়রাজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং সন্ধির প্রস্তাব দেন।কিন্তু মালিক কাফুর এ প্রস্তাবে অসম্মতি জানান। কাফুর দাবি করেন যে, রাজা তাঁর সম্পূর্ণ ধন-সম্পত্তি প্রদানসহ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে দিল্লিতে কর পাঠাবার অঙ্গীকার করলে, তিনি ব্যাপক নরহত্যা করবেন না। মালিক কাফুরের শর্ত মেনে নেয়া ছাড়া রুদ্রদেবের কোন উপায় ছিল না। বিপুল ধন-রত্নসহ মালিক কাফুর দিল্লিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

দ্বারসমুদ্র জয়

দিগ্বিদিকে সুলতানি বাহিনীর উত্তরোত্তর সাফল্যে সুলতান আলাউদ্দিন বেশ উৎসাহী হয়ে ওঠেন। দাক্ষিণাত্যের বিপুল ধনরত্ন তাঁকে লোভী করে তোলে। কৃষ্ণা নদী পার হয়ে ১৩১০ খ্রিস্টাব্দে কাফুরের নেতৃত্বে সুলতানি বাহিনী দ্বারসমুদ্র বা হোয়শল রাজ্য আক্রমণ করে। রাজা তৃতীয় বীরবল্লাল এই সময় দক্ষিণে পান্ড্যরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সুলতানি বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি রাজধানী রক্ষার জন্য ছুটে আসেন। বীর পান্ড্যও একটি সেনাদল তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠান। কিন্তু সুলতানি সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধ অর্থহীন বুঝে বীরবল্লাল যুদ্ধ ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর বহু ধনরত্ন, ঘোড়া ও হাতি কাফুরের হাতে তুলে দেন। আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করে তিনি বার্ষিক কর প্রদানেও অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।

পান্ড্যরাজ্য জয়

অত:পর মালিক কাফুর মাদুরার পান্ড্য রাজাদের দিকে মনোনিবেশ করেন।মালিক কাফুর বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ মাদুরা গমন করেন। তিনি পথে অনেক হাতি হস্তগত করেন এবং বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে পান্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরার নিকট পৌঁছান। সুলতানি বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে রাজা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন।এখানেও মালিক কাফুর হাতি-ঘোড়াসহ প্রচুর ধন-সম্পত্তি হস্তগত করেন। দিল্লিতে ফিরে আসলে সুলতান তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

দেবগিরির রাজা রামদেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শঙ্করদেব দিল্লিতে কর পাঠানো বন্ধ করে দেন। সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শঙ্করদেবকে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। আলাউদ্দিন মালিক কাফুরকে দেবগিরি আক্রমণ করতে পাঠান। ১৩১২ খ্রিস্টাব্দে মালিক কাফুর বিরাট সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে দেবগিরি অভিমুখে রওনা হন। শঙ্করদেব কাফুরকে বাধা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি পরাজিত হলে মালিক কাফুরের নির্দেশে তাঁকে হত্যা করা হয়। এভাবে সুলতান আলাউদ্দিন সারা দাক্ষিণাত্য জয় করতে সমর্থ হন।

উত্তর ভারতে সকল বিজিত রাজ্য আলাউদ্দিন সুলতানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তিনি অবলম্বন করেন কিছুটা ভিন্ন নীতি। দক্ষিণী রাজ্যগুলোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সেগুলোকে তিনি দিল্লির করদ রাজ্যে পরিণত করেন। সম্পূর্ণভাবে মুসলমান শাসন দাক্ষিণাত্যে প্রবর্তিত হয়নি। সুলতানের এই বদান্যতায় ও অনুগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষিণী নৃপতিগণ তাঁর মিত্রে পরিণত হন। এমনকি তাঁরা সুলতানের অন্যান্য সামরিক অভিযানে সাহায্যও করেন।

সারসংক্ষেপ

জালালউদ্দিন খলজী হলেন প্রথম উল্লেখযোগ্য খলজী পুরুষ। 'খলজী বিপ্লব'-এর তিনিও একজন অংশীদার। মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব রয়েছে। জালালউদ্দিনের ভ্রাতুস্পুত্র আলাউদ্দিন খলজী হলেন শ্রেষ্ঠ খলজী শাসক। নানাবিধ ঘটনার মধ্যদিয়ে ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দিন ছিলেন যুদ্ধপ্রিয় এবং সাম্রাজ্যবাদী। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অংশেই তিনি

বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমরাভিযান পরিচালনা করেন। এগুলোর মধ্যে গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, দেবগিরি, পান্ড্যরাজ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বিপুলভাবে জনপ্রিয়। দাক্ষিণাত্যে মূলত আলাউদ্দিন করদ রাজ্য সৃষ্টি করেন, কিন্তু উত্তরভারতে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আলাউদ্দিন খলজী সিংহাসনে আরোহণ করেন–

(ক) ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১২৯৬ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১২৯৫ খ্রিস্টাব্দে।

২। আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল–

(ক) আলেকজান্ডারের মতো বিশ্বজয়

(খ) সমগ্র ভারতে সার্বভৌম রাজ্যশক্তি প্রতিষ্ঠা

(গ) সমগ্র ভারতে অর্থনৈতিক আধিপত্য স্থাপন

(ঘ) খলজী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

৩। ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোন অঞ্চলে আলাউদ্দিনের অভিযান প্রেরিত হয়?

(ক) রণথম্ভোর (খ) দেবগিরি

(গ) গুজরাট (ঘ) চিতোর।

৪। মেবার রাজ্যের রাজধানীর নাম–

(ক) চিতোর (খ) মাদুরাই

(গ) দেগবিরি (ঘ) তেলেঙ্গনা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। খলজী বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২। খলজীবিপ্লবের গুরুত্ব কি ছিল?

৩। আলাউদ্দিন খলজীর প্রথম জীবন সম্পর্কে কি জানেন?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সাম্রাজ্য বিস্তারকারী হিসেবে আলাউদ্দিন খলজীর ভূমিকা বর্ণনা করুন।

২। আলাউদ্দিন খলজীর উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারত বিজয় সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। মোঙ্গল আক্রমণকারীদের তিনি কিভাবে প্রতিরোধ করেন?

৩। আলাউদ্দিন খলজীর দাক্ষিণাত্য নীতি পর্যালোচনা করুন। এ নীতির সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। K.S. Lal, *History of Khaljis.*

২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

৩। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*

৪। আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*

৫। R.C. Majumdar &Others (ed), *The History and Culture of the Indian People*, Vol. IV. *Delhi Sultanate.*

পাঠ - ২

আলাউদ্দিন খলজীর সংস্কার

উদ্দেশ্য ঃ

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- আলাউদ্দিন খলজীর প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে জানতেপারবেন ;
- আলাউদ্দিন খলজীর রাজস্ব ও অর্থনৈতিক সংস্কার মূল্যায়ন করতে পারবেন ;
- আলাউদ্দিন খলজীর সামরিক সংস্কার কর্মসূচি জানতে পারবেন।

আলাউদ্দিন খলজীর রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য

আলাউদ্দিন খলজী ছিলেন তৎকালীন যুগের শক্তিশালী শাসকের এক উলে- খযোগ্য দৃষ্টান্ড়। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের তিনটি বৈশিষ্ট্য স্থায়ী গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রথমত: দিল্লির মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের বৃহত্তর অংশ নিয়ে একটি সাম্রাজ্য গঠন করেন। দ্বিতীয়ত: যে তুর্কি সাম্রাজ্য এতোদিন পর্যন্ড় ছিল কেবল কতকগুলো 'সামরিক জায়গীর' এর সমবায়, আলাউদ্দিন তার শাসনব্যবস্থায় কিছু পরিমাণে সংহতি সাধন করেন। তৃতীয়ত: আলাউদ্দিন রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামি আইনের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নতুন বলিষ্ঠ নীতি প্রবর্তন করেন এবং সংস্কার কর্মসূচির দিক থেকে উলে- খযোগ্য অবদান রাখেন।

প্রশাসনিক সংস্কার

মধ্যযুগীয় রীতি অনুযায়ী রাজতন্ত্রের ওপর অভিজাত শ্রেণী এবং উলামাদের প্রভাব ছিল সর্বময়। আমীর, মালিক প্রভৃতি অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন রাজনৈতিক পদাধিকারবলে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং প্রবল কর্তৃত্বের অধিকারী। নব প্রতিষ্ঠিত দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উৎসভূমি এই শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা বা সাহস আলাউদ্দিন খলজীর পূর্ববর্তী শাসকদের ছিলনা। বলবনও শ্রেণী হিসেবে অভিজাতদের মর্যাদা খর্ব করতে চাননি। কিন্তু আলাউদ্দিন খলজী দৃঢ়ভাবে অভিজাত শ্রেণী এবং উলামাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অস্বীকার করে রাজতন্ত্রকে একটি নতুন মর্যাদা দেন। বলবনের মতো সুলতান আলাউদ্দিনও শাসনকার্যে দক্ষতা ফিরিয়ে আনেন। তিনি নি:সন্দেহে সুচতুর সমরকুশলী ছিলেন এবং সমরকুশলতার সাথেসাথেশাসনকার্যেও সুচতুর ছিলেন।তিনি প্রথম হতেই কুচক্রী ও বিদ্রোহীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি এদের দমন করার জন্য একাধিক আইন প্রণয়ন এবং কঠোরভাবে তা প্রয়োগ করেন।

আলাউদ্দিন খলজী সুলতানের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতার তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই আত্মীয় পরিজন এবং রাজকর্মচারীদের উপর্যুপরি বিদ্রোহ তাঁকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি অনুভব করেন যে, প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থার মধ্যেই বিদ্রোহাত্মক প্রবণতার বীজ লুকায়িত আছে। তিনি বিভিন্ন সময় আলোচনার মাধ্যমে সনাক্ত করতে সক্ষম হন যে, বিদ্রোহের চারটি সম্ভাব্য কারণের মধ্যে রয়েছে (১) প্রজাসাধারণের শুভাশুভ সম্পর্কে সুলতানের অজ্ঞতা; (২) অবাধ মদ্যপানের সুবাদে বিভিন্ন মানুষের একত্রিত হওয়া এবং মিত্রতাবদ্ধ হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া; (৩) অভিজাতদের অবাধ মেলা-মেশা, পারস্পরিক আত্মীয়তা এবং পারিবারিক মিলনসূত্রে সুলতানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জোটবদ্ধ হওয়া; এবং (৪) জনগণের হাতে অধিক অর্থ সম্পদ সঞ্চিত হওয়া এবং সেই সূত্রে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাওয়া এবং প্রচুর অবসরের সুযোগে "অলস মস্তিষ্ককে শয়তানের কর্মশালায়" পরিণত করা ইত্যাদি।

চারটি জরুরি নির্দেশনামা

উপর্যুক্ত কারণগুলো নির্মূল করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন খলজী চারটি জরুরি নির্দেশনামা জারি করেন। প্রথমত: তিনি রাষ্ট্রপ্রদত্ত সমস্ত রকমের ধর্মীয় দান (ওয়াকফ্), অনুদান (মিল্ক), উপহার (ইনাম) ইত্যাদি হিসেবে প্রদত্ত জমি অধিগ্রহণ করে 'খালিসা' জমিতে পরিণত করেন। ইতোপূর্বে ইনাম, মিল্ক, ওয়াকফ্ ইত্যাদি সূত্রে সম্পত্তি লাভ করার ফলে বহু পরিবার সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। এমনকি আলাউদ্দিন খলজীও সিংহাসনে আরোহণ করার সময় এসব খাতে বহু জমি দান করেন। অবশ্য দুএকটি ব্যতিক্রম ছিল। যেমন ইসামীর বংশধরদের প্রদত্ত দুটি গ্রাম ফিরিয়ে নেয়া হয়নি। তবে সামগ্রিকভাবে এই ব্যবস্থা অনেক পরিবারের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। একই সঙ্গে আলাউদ্দিন তাঁর কর্মচারীদের আদেশ দেন যে, আইন বাঁচিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে যতো বেশি সম্ভব অর্থ আদায় করে নেবার ব্যাপারে তাঁরা যেন যত্নবান হন। আলাউদ্দিনের এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দিল্লিতে মালিক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বণিক ও হিন্দু ব্যাংকারগণ ব্যতিত খুব কম লোকের হাতেই স্বর্ণ সঞ্চিত ছিল। ফলে জনসাধারণ জীবিকা অর্জনের জন্য সদাব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয় এবং সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অবকাশ কমে যায়।

দ্বিতীয়ত: আলাউদ্দিন খলজী রাজ্যের গুপ্তচরবাহিনী পুনর্গঠন করেন। তিনি হাট-বাজার এবং অভিজাতদের আবাস থেকে সমস্ত ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তা সুলতানের কর্ণগোচর করার জন্য বারিদ, মুনহি, জাসুস নামক অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। গুপ্তচর ব্যবস্থার ব্যাপকতার ফলে অভিজাতগণ সর্বদা সংকুচিত ও সন্ত্রস্ত থাকতেন। এমনকি প্রকাশ্যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মতবিনিময়ের একান্ত প্রয়োজন হলে মুখে না বলে আকারে ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত করতেন। এ ব্যবস্থার ফলে ষড়যন্ত্রের সামান্যতম সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়ত:আলাউদ্দিন খলজী দিল্লিতে মদ্যপান ও মদ প্রস্তুত নিষিদ্ধ করেন। সরকার অনুমোদিত মদ প্রস্তুতকারকদের দিল্লি থেকে বহিষ্কার করা হয়। সুলতান স্বয়ং মদ্যপান ত্যাগ করেন এবং সমস্ত মদের বোতল বাদাউন গেটের সামনে এনে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন। প্রচলিত আছে, এখানে এতো মদ ঢালা হয়েছিল যে, বিস্তীর্ণ এলাকা বর্ষাকালের মতো কাদায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য মদের চোরাই আমদানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ কিছুটা সংশোধিত করা হয়। বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি একান্তভাবে নিজের গৃহাভ্যন্তরে আইনানুগভাবেই মদ প্রস্তুত করতে পারতেন। তিনি জুয়া খেলা সমানভাবে নিষিদ্ধ করেন।

চতুর্থত: আলাউদ্দিন খলজী অভিজাতদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা, কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আনন্দ সভায় একত্রিত হওয়া এবং সুলতানের অনুমতি ব্যতিত নিজেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ করেন। বস্তুত, এই নির্দেশের ফলে সমাজ জীবনে বেশ পরিবর্তন সূচিত হয়। তবে অভিজাতদের গোষ্ঠীচক্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা এই নির্দেশে কিছুটা দূরীভূত হয়।

রাজস্ব নীতি

আলাউদ্দিন খলজী প্রশাসনিক ও সামরিক কর্মসূচির পাশাপাশি সংস্কারমূলক কর্মসূচিও রূপায়িত করার উদ্যোগ নেন। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে রাজকোষের আয়ের প্রধান উৎস যে ভূমি রাজস্ব, এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী সুলতানদের নীতি পরিহার করেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রয়োজন অনুভব করেন। কেবল রাজকোষকে সমৃদ্ধ করা নয়; রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতেও তিনি রাজস্ব-প্রশাসনের কাঠামোর পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুভব করেন। তিনিই প্রথম রাজস্ব ব্যবস্থায় উলে- খযোগ্যভাবে পরিবর্তন ঘটান।

আলাউদ্দিন খলজী সিংহাসনে আরোহণের সময় প্রচলিত ভুমি ব্যবস্থা অনুসারে কৃষিযোগ্য জমি কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সুলতানের 'খালিসা' জমির রাজস্ব সরাসরি রাজকোষে জমা পড়তো। দেওয়ান-ই-

উজিরত -এর অধীনে আমিল, কারকুন প্রমুখ কর্মকর্তা এই রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। কিছু জমি 'ইজারা' হিসেবে ইক্তাদার বা মাক্তিরা ভোগ দখল করতেন। এই জমিকে বলা হতো ইক্তা। মাকতি জমির রাজস্ব সংগ্রহ করে ইক্তার ব্যয় বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত অংশ কেন্দ্রীয় রাজকোষে পাঠাতে বাধ্য ছিলেন। তবে এই সময়ে ইক্তা প্রশাসন নানা অজুহাতে সমস্ড় রাজস্বই ভোগ করতো।

খুৎ, মুকদ্দম, চৌধুরী নামধারী রাজস্ব সংগ্রাহকবৃন্দ ইক্তার রাজস্ব আদায় এবং কারচুপির কাজে জড়িত ছিলেন। স্বাধীন হিন্দু রাজাদের অনেকেই সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এরা দিল্লির আনুগত্য স্বীকার এবং নিজ নিজ ভূখন্ড থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ সুলতানের কোষাগারে জমা দেবার শর্তে কিছু ভূমি ভোগ-দখল করতেন। এ ছাড়া কিছু জমি দান বা উপহার হিসেবে(মিল্ক, ইনাম, ওয়াক্ফ) জ্ঞানী বা ধার্মিক ব্যক্তিদের বরাদ্দ করা হয়েছিল। বহু সরকারি কর্মকর্তা বা অভিজাতও এরূপ জমি ভোগ দখল করতেন।

রাজস্ব সংস্কার কর্মসূচি হিসেবে আলাউদ্দিন এক জাওবিৎ জারি করে বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা, অভিজাত বা অন্যান্যদের হাতে বরাদ্দ মিলক্, ইনাম, ওয়াকফভুক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেন।এগুলো সুলতানের খালিসা জমির অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সরকারি সংগ্রাহকদের মারফৎ সরাসরি রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দু-মুসলমান, সরকারি বেসরকারি নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর কাছ থেকেই এ ধরনের জমি কেড়ে নেয়া হয়। অত:পর আলাউদ্দিন গ্রামীণ রাজস্ব সংগ্রাহকদের দিকে নজর দেন।

পূর্বরীতি অনুসারে খুৎ, মুকদ্দম ও চৌধুরীরা নির্দিষ্ট গ্রাম বা গ্রাম সমষ্টির রাজস্ব সংগ্রহ করে তা চুক্তি মতো রাজকোষে জমা দিতেন। আলাউদ্দিন এ সব রাজস্ব-সংগ্রাহকদের গ্রামীণ-বৈভব ও অসাধুতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে কঠোরভাবে এদের দমন করার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ এসব খুৎ, মুকদ্দম প্রমুখ মহার্ঘ পোশাক পড়তো, ঘোড়ায় চড়ে শিকার করে বেড়াতো, কিন্তু নিজেদের জমি থেকে এরা খারাজ, জিজিয়া, ঘরী, চরাই ইত্যাদি খাতে এক জিতলও রাজকোষে প্রদান করতো না। অথচ এরা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট জমি থেকে যথারীতি, অনেক ক্ষেত্রে বেশি, 'খুতি' আদায় করতেন এবং নিজেদের ভোগে লাগাতো। ফলে সাধারণ চাষী শোষিত হতো, কিন্তু সরকার উপকৃত হতেন না। এই অব্যবস্থা দূর করার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন কয়েকটি সংশোধনমূলক আইন জারি করেন।

আলাউদ্দিনের প্রথম জাওবিৎ অনুযায়ী চাষযোগ্য জমি জরিপ করে খুৎ, মুকদ্দম এবং বলহার বা সাধারণ কৃষককে একই হারে রাজস্ব প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়। রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করা হয় উৎপাদনের ৫০ শতাংশ। দ্বিতীয় জাওবিৎ অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব ছাড়াও 'ঘরী' বা গৃহকর, চরাই বা পশুচারণ কর প্রবর্তন করেন। 'করহি' নামের একটি করের উল্লেখ পাওয়া যায়, যদিও এর অর্থ সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা নি:সন্দেহ নন।

গ্রামীণ মধ্যস্বত্বভোগীদের অস্তিত্ব লুপ্ত করার ফলে প্রশাসন পরিচালনার জন্য একদল সুদক্ষ সরকারি রাজস্ব কর্মকর্তার প্রয়োজন হয়। আলাউদ্দিন এই কাজের জন্য মুহশিল (রাজস্ব-নির্ধারক), আমিল(করসংগ্রাহক), গোমস্তা (প্রতিনিধি), মুতাশরিফ (হিসাব-পরীক্ষক), দপ্তরী (অফিস কর্মী), নভীসদাস (করণিক) প্রমুখকে নিয়োগ করেন। পাটোয়ারী বা গ্রামীণ হিসাব রক্ষকের কাছে সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়।

আলাউদ্দিনের রাজস্ব-ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল জমির পরিমাপ বা জরিপ। সমগ্র রাজ্য জরিপের অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলেও জমির পরিমাপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণের রীতি প্রবর্তন করে আলাউদ্দিন খলজী রাজস্বব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত রূপ দেন। তিনিই সর্বপ্রথম জমি জরিপের রীতি প্রবর্তন করেন।

আলাউদ্দিন রাজস্ব আদায় কাজে নিয়োজিত অন্য কর্মীদের অসাধুতা বন্ধ করার বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। সুলতানের নির্দেশে গোমস্তা, মুতাশরিফ, মুহশিল প্রভৃতি রাজস্ব-কর্মচারীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখার জন্য 'দেওয়ান-ই-মুস্তাকরাজ' নামে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর খোলা হয়। কোন কর্মচারী তাঁর কাজে ফাঁকি দিলে কিংবা সংগৃহীত অর্থ রাজকোষে জমা না দিয়ে পুরোপুরি বা আংশিক আত্মসাৎ-এর চেষ্টা করলে তাদের ওপর কঠোর শাস্তি নেমে আসতো।

আলাউদ্দিন তাঁর রাজস্ব নীতির মাধ্যমে খুৎ, মুকদ্দম প্রমুখের শোষণ থেকে সাধারণ কৃষক বা বলাহারদের রক্ষা করেন। তবে আলাউদ্দিন একটি নির্দেশে বলেন যে, রাজস্ব এমনভাবে আদায় করতে হবে যাতে কৃষকের খাদ্যশস্য, দুধ, দই ইত্যাদির অভাব না হয়, আবার তাদের হাতে যেন অতিরিক্ত সম্পদও সঞ্চিত না হয়। তাঁর নীতি অনুসারে দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করতো। কারণ দৈনিক খাদ্য-পানীয়ের অতিরিক্ত সঞ্চয় চাষীদের কাছে থাকতো না, যা দিয়ে আপদকালীন অবস্থা তারা সামাল দিতে পারতো। তথাপি ইতোপূর্বে কখনোই মোট উৎপাদনের ২৫ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো না। কিন্তু আলাউদ্দিন এই হার ৫০ শতাংশে উন্নিত করেন। অনেক ঐতিহাসিক এই বৃদ্ধিকে সুস্থ অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন না।

সামরিক সংস্কার

মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থাপনই আলাউদ্দিনের সুলতানি রাজতন্ত্রের চরম সাফল্য। তিনি বুঝেছিলেন, এই সাফল্য নির্ভর করে স্থায়ী এক সুদক্ষ সেনাবাহিনীর ওপর। তাই তিনি এক সুদক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সামরিক বাহিনীর সংস্কারে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

আলাউদ্দিন খলজীই দিল্লির প্রথম সুলতান, যিনি একটা স্থায়ী শক্তিশালী সেনাবাহিনীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। দিল্লিতে সদা-সর্বদা যে-কোন প্রয়োজনের জন্য এই স্থায়ী সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। তিনি এই বিশাল সুগঠিত ও সুসংহত সামরিক বাহিনীর জন্যই প্রায় বিশ বছর ধরে নিরঙ্কুশ একনায়কের মতো বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনায় সক্ষম হয়েছিলেন। তাই আলাউদ্দিন পূর্ববর্তী সামরিক বিভাগের ত্রুটিগুলো দূর করে সেনাবাহিনীকে নতুন পদ্ধতিতে সংগঠিত ও সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, এক নতুন খলজী সামরিক পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেন।

সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের ও সংস্কারের জন্য 'আরিজ-ই-মমালিক' নামে সামরিক বিভাগের মন্ত্রীকে বিশেষ ক্ষমতা দেন। সামরিক বিভাগের মন্ত্রী প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি সৈন্য নিয়োগ করতে থাকেন। প্রতিটি রাজকীয় বাহিনীকে একজন দক্ষ সামরিক অফিসারের কর্তৃত্বে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আলাউদ্দিনের সেনাবাহিনীতে দেহরক্ষী, অশ্বারোহী ও পদাতিক এই তিনটি বিভাগ ছিল। এই বাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই নিয়োগ করা হতো।

আলাউদ্দিন খলজীর সেনাবাহিনীর গঠন ও ব্যবস্থাসমূহ মূলত তুর্কিদের সামরিক ব্যবস্থার আদর্শের ওপর গড়ে ওঠে। তবে তিনি জায়গীরের পরিবর্তে রাজকোষ থেকে সরাসরি নগদে সৈন্যদের বেতন দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মোট ৪,৭৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। প্রত্যেক স্থায়ী সৈন্যকে বছরে ২৩৪ তঙ্কা বেতন দেয়া হতো। তবে কোন অশ্বারোহী সৈন্য যদি দুটি ঘোড়া রাখতো, তাদের ৭৮ তঙ্কা বেশি দেয়া হতো। আলাউদ্দিন খলজী সৈন্যবাহিনীতে দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য হুলিয়া ও দাগ প্রথার প্রচলন করেন। নিয়মিত সৈন্যরা যুদ্ধের সময় হাজিরা না দিয়ে অশিক্ষিত লোকদের বদলী হিসেবে পাঠাতো এবং যুদ্ধের ভাল ঘোড়ার পরিবর্তে চাষের ঘোড়া পাঠাতো। এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য তিনি হুলিয়া ব্যবস্থা দ্বারা খাতায় প্রতি সৈন্যের দৈহিক বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেন। ঘোড়ার গায়ে লোহা পুড়িয়ে দাগ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

অর্থনৈতিক সংস্কার ঃ মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আলাউদ্দিন খলজী একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর বিরাট সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রয়োজন । সুতরাং তিনি সৈন্যবাহিনী পুনর্গঠন করেন। বিশাল সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি আলাউদ্দিন খলজীকে প্রায় ৫০ হাজার ক্রীতদাস কর্মচারীর ভরণপোষণ করতে হতো। তিনি সৈন্যবাহিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। অধিকন্তু, ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের পর আলাউদ্দিন খলজী বেশ কয়েকটি ব্যয়বহুল প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এ সব কারণে তাঁর বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। এদিকে দাক্ষিণাত্য জয়ের পর দিল্লিতে প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্যের আমদানির ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে

যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সৈন্যদের বেতন বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যদিও তিনি রাজস্বের হার বৃদ্ধি করেন এবং দেবগিরি হতে বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু হিসাব করে দেখা যায় যে বর্ধিত হারে বেতন দিলে পাঁচ থেকে ছয় বছরের মধ্যে রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তিনি উপলব্ধি করেন যে, যদি জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তবে সৈন্যবাহিনীর প্রতিজনকে ২৩৪ টাকা হারে বেতন দিলেই চলবে। কারণ জিনিসপত্রের দাম কম থাকলে এই টাকায় সৈন্যরা তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে পারবে। আলাউদ্দিন খলজী মূলত তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর স্বার্থেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রচলন করেন।

সুলতান আলাউদ্দিনের সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো; স্বভাবতই যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ীদের মালপত্র আনা নেয়ার বিশেষ অসুবিধা হতো। মোঙ্গল আক্রমণের সময় মুলতানের শস্য-বিক্রেতারা দিল্লিতে আসতে পারতো না এবং এই কারণে দিল্লির শস্যের বাজার প্রায়ই উর্ধ্বগামী থাকতো। সুলতান এটি বিশেষভাবে অনুধাবন করেন এবং এই অসুবিধা দূর করার জন্য তিনি দুটি পন্থা অবলম্বন করেন। প্রথমত: তিনি দিল্লি ও এর আশেপাশে রাজকীয় শস্যভান্ডার নির্মাণ করে সেখানে খাদ্যশস্য মজুদ করতেন, যাতে অভাবের সময় কম মূল্যে ঐ খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়া যায় এবং দ্বিতীয়ত: তিনি বাজারদরও নির্ধারণ করে দেন। অভাবের সময় তিনি খাদ্যশস্য বন্টন ও সীমিত করে দেন অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণের বেশি কেউ ক্রয় করতে পারতো না। অবশ্য অন্যান্য সময়ে জনসাধারণ ইচ্ছামতো কেনাবেচা করতে পারতো।

সুলতানের আদেশ মতো খাদ্যশস্য রাজকীয় শস্যাগারে জমা করা হতো। বিভিন্ন এলাকা হতে শস্য আমদানি করার জন্য ব্যবসায়ীদের অগ্রিম টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দোয়াব এলাকায় জমির খাজনাস্বরূপ শস্য আদায় করতে সুলতান নির্দেশ দেন। বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য-শস্য, কাপড়-চোপড়, ঘোড়া এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশু, এমনকি দাসদাসীও বাজারদর নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতাভুক্ত হয়। এই আইন যথাযথভাবে পালনের জন্য ব্যবসায়ীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয় এবং আইন ভঙ্গকারীদের কঠোর শাস্ড়ি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই আইন যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা তদারক করার জন্য সুলতান একটি বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী নিয়োগ করেন।

বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরি করা হয়। সকল ব্যবসায়ীকে রেজিস্ট্রি করা হয় এবং তাদের পরিবারের দিল্লিতে বসবাস বাধ্যতামূলক করা হয়। বাজারদর নিয়ন্ত্রণ এবং বাজার তদারক করার জন্য সুলতান আলাউদ্দিন খলজী 'দিওয়ান-ই-রিয়াসাত' এবং 'শাহানা-ই-মন্ডি' উপাধিধারী দুজন উচ্চপদস্থ অফিসার নিযুক্ত করেন। তাদের অধীনে আরও অসংখ্য নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তারা ঘুরে ঘুরে বাজার পরিদর্শন করতো এবং আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতো। সুলতান কর্তৃক আইন প্রণয়নের ফলে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। একটি প্রথম শ্রেণীর ঘোড়া ১০০ টাকা হতে ১২০ টাকায় পাওয়া যেতো। একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোড়া ৮০ হতে ৯০ টাকায় এবং একটি ৩য় শ্রেণীর ঘোড়া ১০ হতে ২৫ টাকার মধ্যে পাওয়া যেতো। একটি গাভীর দাম ছিল ৪ থেকে ৫ টাকা। অনুরূপভাবে সব ব্যবহার্য জিনিসের দাম কম ছিল। খাদ্যশস্যের দাম মণ প্রতি নির্দিষ্ট ছিল এবং কোন ব্যবসায়ীই তা অমান্য করতে পারতো না। সুলতান নিজেও মাঝে মাঝে বাজার তদারক করতেন। তিনি কারও কারও মাধ্যমে বাজার দর পরীক্ষার জন্য বাজার থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করাতেন। জিনিসপত্রের ওজন কম হলে বা দাম বেশি হলে সুলতান দিওয়ান ও শাহানাকে সতর্ক করে দিতেন এবং অপরাধীর বিচারের ব্যবস্থা করতেন।

আলাউদ্দিন খলজী তাঁর মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিকে কার্যকরী করার জন্য মালিক কাবুলকে শাহানা-ই-মন্ডির দায়িত্ব দেন। এই সৎ কর্মচারীটি তার সহকারীদের সাহায্যে মূল্য তালিকা স্থির করতেন, ব্যবসায়ীদের নাম-ধামের খবর রাখতেন এবং অশ্বারোহী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহী কৃষকদের খাদ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতেন। আলাউদ্দিন খলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। মতভেদের প্রধান কারণ হলো, সুলতান সারা সাম্রাজ্যে এই নীতি প্রবর্তন করতে পারেননি। এই নীতি শুধু দিল্লি এবং এর আশেপাশের জন্য প্রযোজ্য ছিল। ফলে অন্যান্য অঞ্চলে এটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল – এটাই স্বাভাবিক। কেননা কৃষক এবং ব্যবসায়ী তাঁরা উৎপাদন এবং বাণিজ্য কার্য পরিচালনা করে থাকে অধিক লাভের আশায়। সঙ্গত কারণেই তারা ছিল ক্ষুব্ধ;

তেমনি ভাবে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত জনগণও তুষ্ট ছিলনা এটাই স্বাভাবিক। কারণ দিল্লির অধিবাসীদের মঙ্গল সাধন করে সকল মানুষের মঙ্গল কামনা করা সুলতানের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তারপরেও মধ্য যুগের পরিস্থিতিতে আলাউদ্দিন খলজীর ব্যবস্থা অভিনব ছিল সন্দেহ নেই। এই নীতি প্রবর্তনের মাধ্যমে তিনি মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতেও সক্ষম হন।

সারসংক্ষেপ

দিল্লির মুসলমান শাসকদের মধ্যেআলাউদ্দিন খলজী সংস্কারক হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রশাসনিক দিক থেকে আলাউদ্দিন অভিজাত শ্রেণী এবংউলামাদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। তিনি ছিলেন সুলতানের নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তিনি চারটি জরুরি নির্দেশনাও জারি করেন। রাজস্ব ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন আলাউদ্দিনের অবদান। তিনি জমি জরিপ এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকারি কর্মচারি নিয়োগ করেন। এ কাজে তিনি কঠোর শাস্তিরও প্রবর্তন করেন। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আলাউদ্দিনের সুলতানি রাজতন্ত্রের চরম সাফল্য। সামরিক বিভাগে তিনি কার্যকর সংস্কার সাধন করেন। তাঁর প্রবর্তিত হুলিয়া ব্যবস্থা ও দাগপ্রথা কার্যকর হয়। আলাউদ্দিন খলজীর মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল এক অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবশ্য এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করাও সম্ভব হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে (√) চিহ্ন দিন।

১। আলাউদ্দিন খলজী বিশ্বাসী ছিলেন–

(ক) গণতান্ত্রিক ক্ষমতায় (খ) প্রজাহিতৈষী স্বৈরাচারী ক্ষমতায়

(গ) নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী ক্ষমতায় (ঘ) রাজতান্ত্রিক ক্ষমতায়।

২। 'মুহশীল' কারা ছিলেন?

(ক) রাজস্ব নির্ধারক (খ) হিসাব পরীক্ষক

(গ) করণিক (ঘ) অফিস কর্মী।

৩। 'ঘরী' অর্থকী?

(ক) পশুচারণ কর (খ) যুদ্ধ কর

(গ) গৃহকর (ঘ) বাণিজ্য কর।

৪। আলাউদ্দিন খলজীর স্থায়ী সৈন্যের বেতন ছিল–

(ক) ২০০ তঙ্কা (খ) ২১৪ তঙ্কা

(গ) ২৩০ তঙ্কা (ঘ) ২৩৪ তঙ্কা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। আলাউদ্দিন খলজীর প্রশাসনিক সংস্কার আলোচনা করুন।

২। আলাউদ্দিন খলজীর চারটি জরুরি নির্দেশনামা বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সংস্কারক হিসেবে আলাউদ্দিন খলজীর মূল্যায়ন করুন।

২। আলাউদ্দিন খলজীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। K.S. Lal, *History of Khaljis.*

২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

৩। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*

৪। আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*

৫। R.C. Majumdar &Others (ed), *The History and Culture of the Indian People*, Vol. IV. *The Delhi Sultanate.*

পাঠ - ৩

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের জীবন ও কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা অর্জন করবেন ;
- মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানবেন ;
- মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে বিদ্রোহ ও বংশের আসন্ন পতন সম্পর্কে তথ্য পাবেন।

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খলজী বংশের আকস্মিক পতনের পরই তুঘলক বংশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এ বংশের রাজত্বকাল ইতিহাসের সময় বিচারে স্বল্পায়ূ হলেও (১৩২০–১৪১২ খ্রিঃ) উপমহাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

১৩২০ খ্রিস্টাব্দের শেষে খলজী শাসক কুতুবুদ্দিন মোবারক খলজী তাঁর অনুগৃহীত গুজরাটের পারওয়ারী বংশোদ্ভূত নিচু বর্ণের হিন্দু স্বধর্মত্যাগী খসরু কর্তৃক নিহত হন। ফলে খলজী শাসনের অবসান ঘটে। সুলতানের হত্যাকারী খসরু নাসিরউদ্দিন খসরু শাহ নামে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। খসরু শাহ খলজী বংশের প্রতি অনুরক্ত আমীরদের হত্যা করেন এবং নিজ বংশের লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। এ সময় দিল্লিতে এক ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইসলাম ধর্মের চরম অবমাননা শুরু হয়। ফলে মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা খসরু শাহ-এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে শুরু করেন।

মালিক ফখরুদ্দিন জুনা খান এ সময় দিল্লিতে "আমীর-ই-আখুর" পদে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর পিতা গাজি মালিক পাঞ্জাব অঞ্চলের শাসনকর্তা এবং সফল সেনাপতি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। মালিক জুনা কৌশলে দিল্লি ত্যাগ করে পাঞ্জাবে পিতার সাথে মিলিত হন। পুত্রের কাছে প্রভু হত্যা ও ধর্ম দলনের খবর পেয়ে গাজি মালিক অন্যান্য শাসনকর্তাদের সাথে মিলিত হয়ে দিল্লি অভিযান করেন। গাজি মালিকের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে খসরু শাহ পরাজিত ও নিহত হন। খলজী বংশের কোন উত্তরাধিকারী বেঁচে না থাকায় দিল্লির অভিজাত শ্রেণীর একান্ত অনুরোধে গাজি মালিক 'সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' নামে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবে তুঘলক বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তুঘলকের বংশ পরিচয়

তুঘলক শাসকদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে পন্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। তবে সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে, তুঘলক শাসকরা মূলত তুর্কি এবং তুর্কিদের করৌনা গোত্রভুক্ত। যতটুকু জানা যায়, গাজি মালিকের পিতা মালিক তুঘলক দিল্লির প্রবল প্রতাপান্বিত সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের ক্রীতদাস ছিলেন। মালিক তুঘলক পাঞ্জাবের জনৈকা জাঠ নারীকে বিয়ে করেন। এ নারীর গর্ভজাত সন্তান হলেন গাজি মালিক।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০–১৩২৫)

একজন সাধারণ সৈন্য হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি নিজ যোগ্যতাবলে ক্রমে পদোন্নতি পেয়ে সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর শাসনকালে সালতানাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সে পদে বহাল ছিলেন।এ সময়কালে তিনি বীরত্বের সাথে মোঙ্গল হামলা প্রতিহত করে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

অভ্যন্ড়রীণ ব্যবস্থা

সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সালতানাতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। পূর্ববর্তী দুজন শাসকের অনাচার ও অবহেলার কারণে প্রশাসন ও অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল। তিনি অত্যন্ত কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। প্রদেশগুলোতে যোগ্য শাসক নিযুক্ত করে প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে তোলেন। জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি রাজস্ব হ্রাস এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তিনি দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সাহায্য এবং কৃষকদের জন্য ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। প্রশাসনের অন্যান্য শাখাও তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং গুণীজনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ডাক বিভাগের পুনর্গঠন ও সংস্কার করে তিনি সালতানাতের মাঝে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করেন। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সামরিক চৌকি ও দুর্গ স্থাপন করে তিনি সামরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। দিল্লির অদূরে তিনি বিখ্যাত 'তুঘলকাবাদ' দুর্গ নির্মাণ করেন।

রাজ্য বিজয়

সৈনিক হিসেবে অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক সালতানাতের সর্বত্র নিজের কৃতিত্ব স্থাপন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে তিনি দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী রাজাদের দমন করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি মূলত সামরিক প্রাধান্য স্থাপন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। দাক্ষিণাত্য এবং বাংলায় তিনি সামরিক সাফল্য অর্জন করেন।

দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যা

সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর মৃত্যুর পর থেকেই দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গানা রাজ্যের কাকাতীয় বংশের রাজা দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্রদেব দিল্লির আনুগত্য অস্বীকার করে নজরানা প্রদান বন্ধ করে দেন। সুলতান তাঁর বড় ছেলে এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মালিক জুনা খানকে তেলিঙ্গানার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুবরাজ জুনা খান বরঙ্গল দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু কাকাতীয় সৈন্যবাহিনীর চরম প্রতিরোধ ও সৈন্যবাহিনীতে মহামারী দেখা দেওয়ায় জুনা খান অবরোধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। এর অল্পদিন পরে তিনি আবার বরঙ্গল আক্রমণ করে দ্বিতীয় প্রতাপ রুদ্রদেবকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। বরঙ্গলের নতুন নাম রাখা হয় সুলতানপুর। এ সময় জুনা খান মাদুরার পান্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন বলেও জানা যায়। যুবরাজ জুনা খানের নেতৃত্বে দিল্লি বাহিনী উড়িষ্যা আক্রমণ করে রাজা দ্বিতীয় ভানুদেবকে পরাজিত করেন। বিজয়ী যুবরাজ রাজধানীতে ফিরে এলে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক তাঁকে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা জানান।

বাংলা বিজয়

১৩২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহ মারা গেলে তাঁর ছেলেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ সুযোগ গ্রহণ করে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা আক্রমণ করেন। তিনি

শামসউদ্দিন ফিরোজ শাহের বড় ছেলে গিয়াসউদ্দিন বাহাদুরকে পরাজিত ও বন্দি করেন এবং ছোট ছেলে নাসিরউদ্দিন ইব্রহিমকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে দিল্লি ফিরে যান।

বাংলায় সামরিক সাফল্য অর্জন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সর্বশেষ কৃতিত্ব। সকল অভিযান শেষে দিল্লি ফেরার পথে তিনি দিল্লির অদূরে আফগানপুর নামক স্থানে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে দুর্ঘটনায় মারা যান। কোন কোন ঐতিহাসিক সুলতানের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুকে শাহজাদা জুনা খানের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার কোন সূত্র নেই।

চরিত্র

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একজন উদার মনোভাবাপন্ন শাসক ছিলেন। সে কালের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণীর মতে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। সামাজিক কলঙ্কের কালিমামুক্ত নির্মল চরিত্রের অধিকারী সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ছিল অত্যন্ত সাধারণ। সুরা পান ও সেকালে প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না।

গিয়াসউদ্দিন তুঘলক একজন ধর্মভীরু নরপতি ছিলেন। একজন সুন্নী মুসলমান হিসেবে তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির প্রতি নিষ্ঠাবান হলেও ধর্মান্ধতার কলুষকালিমা কখনোই তাঁর উদার হৃদয়কে কলুষিত করতে পারেনি। তিনি আলেম সমাজকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু প্রয়োজনে তাদের প্রতি কঠোর হতে কুণ্ঠিত হননি। নিরপেক্ষ বিচার, ইসলাম ধর্মের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ, আইনের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি ছিল তাঁর চরিত্রের কতিপয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বকালে দিল্লি সালতানাতের মধ্যে তিনি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলায় দিল্লির কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনাও তাঁর কৃতিত্ব।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বড় ছেলে এবং উত্তরাধিকারী শাহজাদা জুনা খান সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক নামে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল উপমহাদেশের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মুসলিম শাসনের সূচনালগ্ন থেকে তাঁর মত বিদ্বান, জ্ঞানী ও প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার অধিকারী আর কোন সুলতান দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেননি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক মধ্যযুগের ইতিহাসের এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। অতুলনীয় গুণাবলীর অধিকারী সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের এক বিয়োগান্তক অধ্যায়।

অভ্যন্তরীণ নীতি

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের দীর্ঘ রাজত্বকালকে (১৩২৫-১৩৫১) মোটামুটিভাবে দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, প্রথম ভাগ ১৩২৫-১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়কালে সুলতান সফলতার সাথে প্রশাসন পরিচালনা এবং বিভিন্ন সংস্কারমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ভাগ ১৩৩৫ থেকে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময় সুলতান নানাবিধ অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হন। এ সকল সমস্যার মোকাবেলা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর মাধ্যমে অন্তহীন সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পান।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক চতুর্দশ শতকের ভারতের ইতিহাসে এক নতুন শাসনব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের ইতিহাসে ধর্মীয় নেতাদের শক্তিশালী প্রভাব বলয় ছিন্ন করে রাজতন্ত্রকে একচ্ছত্র করে তোলার যে চেষ্টা সুলতান আলাউদ্দিন খলজী করেছিলেন, (১২৯৬-১৩১৬) মুহাম্মদ বিন তুঘলক সে

ধর্মীয় নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ করতে সচেষ্ট হন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ফলে তিনি সহজেই আলেমদের মন-মানসিকতা বুঝতে পারতেন। তিনি যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পছন্দ করতেন বলে আলেমদের এড়িয়ে চলতেন। এমনকি তাদের বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা বাতিল করে তাদেরকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এর অর্থ এ নয় যে তিনি ধর্মবিরোধী ছিলেন, বস্তুত তিনি প্রশাসনকে আলেমদের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন মাত্র। রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলার জন্যই সুলতান ধর্মীয় আইন-কানুনের পরিবর্তে যুক্তি ও ন্যায়ের ভিত্তির ওপর প্রশাসন গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।এ প্রচেষ্টা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রগতিশীল হওয়ায় সালতানাতে গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য তিনি তাঁর এ মনোভাব ধরে রাখতে পারেননি। সংস্কার বিমুখ প্রতিক্রিয়াশীল চতুর্দশ শতকের ভারতে মহান সুলতানের এ উদ্দেশ্য সফল হয়নি। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে সুলতান ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাথে আপোষ করতে বাধ্য হন।

বিদ্রোহ দমন

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের প্রথম দিকে বেশ কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি দৃঢ়হাতে এগুলো দমন করেন। ১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতানের ফুপাতো ভাই বাহাউদ্দিন দাক্ষিণাত্যের গুলবর্গায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুলতান বিদ্রোহী বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বাহাউদ্দিন পরাজিত হয়ে কামপিল রাজের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এ অভিযানে সুলতানের বাহিনী কামপিল রাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে। বিদ্রোহী বাহাউদ্দিন হয়সলরাজ তৃতীয় বল্লালের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামপিল বিজয়ের পর সুলতানের বাহিনী হয়সল রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে তৃতীয় বল্লাল পরাজিত হয়ে বাহাউদ্দিনকে সুলতানের সৈন্যদের কাছে হস্তান্তর করে। বিদ্রোহী বাহাউদ্দিনকে প্রাণদন্ড দেয়া হয়। এ সময় তিনি দাক্ষিণাত্যের বিজিত রাজ্যগুলোকে সরাসরি দিল্লির শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। ফলে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর পরপরই মুলতানের শাসনকর্তা বাহরাম আইবা ফিচ্‌লু খান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুলতান এ সময়ে দৌলতাবাদে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকে তিনি দিল্লি হয়ে মুলতান গমন করেন এবং সম্মুখ যুদ্ধে বাহরামকে পরাজিত করে বন্দি করেন এবং প্রাণদন্ডে দন্ডিত করেন।

রাজপুত কাহিনী থেকে জানা যায়, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজপুতনায় রাজা হাম্মির-এর বিরুদ্ধে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে পরাজিত ও বন্দি হয়েছিলেন। সুলতান অর্থ প্রদান এবং বেশ কিছু এলাকার অধিকার ছেড়ে দিয়ে নিজের মুক্তি অর্জন করেন। সমকালীন ফার্সি রচনাবলীতে এর কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত না থাকায় আধুনিক পন্ডিতগণ এ বিষয়কে কাল্পনিক বলে মনে করেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকেই মোঙ্গল হামলার শিকার হয়েছিলেন। ১৩২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দ মোঙ্গল নেতা তারমাশিরীন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়ে এবং পাঞ্জাব ও মুলতান লুণ্ঠন করে দিল্লির কাছে এসে পড়ে। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক হামলাকারীদের পরাজিত করে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, সুলতান অর্থ প্রদানের মাধ্যমে হামলাকারীদের শান্ত করেন। যেভাবেই হোক, এটা সত্য যে, তিনি মোঙ্গল হামলা থেকে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

রাজত্বকালের দ্বিতীয় ভাগে বিদ্রোহ ও পতন

সুলতান তাঁর রাজত্বের এ সময়ে বেশ কয়েকটি সংস্কারমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন (পরিকল্পনাগুলো পরবর্তী পাঠে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে)। কিন্তু তাঁর এই সামরিক সাফল্য স্থায়ী হয়নি। ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হতে শুরু করে। মহতী পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতা রাজকোষ শূন্য করে ফেলে এবং সুলতানের মন-মানসিকতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তিনি অস্থির ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। এ সময় সালতানাতের মৌলবাদী ধর্মীয়গোষ্ঠী প্রকাশ্যে সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করেন। আলেমদের প্রতি বিরূপ মনোভাবসম্পন্ন সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাস্তব ব্যবস্থা হিসেবে মিশরের খলিফার কাছ থেকে তাঁর অনুকূলে ফরমান আনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এতেও অবস্থার তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি।

১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ মাবারের শাসনকর্তা জালালউদ্দিন আহসান শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সুলতান স্বয়ং তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু বরঙ্গলের কাছে পৌঁছালে তাঁর সেনাবাহিনীতে কলেরার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। ফলে তিনি দৌলতাবাদে ফিরে যেতে বাধ্য হন। মাবার অঞ্চল স্বাধীন হয়ে যায়। বাংলার ওপর দিল্লির নিয়ন্ত্রণ কখনো তেমন কার্যকরী ছিল না। মূলত দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব এবং অন্যান্য ভূ-প্রাকৃতিক কারণে বাংলাকে দিল্লির কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হতো না। ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ সোনারগাঁয়ে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অন্যত্র ব্যস্ত থাকায় সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলার বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হন। ফলে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ একজন স্বাধীন সুলতান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়, সুলতান দু'চারটি ছোট খাট বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হলেও সার্বিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন। ১৩৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা সালতানাতের প্রধান আমীর মালিক আইন-উল-মুলক মুলতানীকে দাক্ষিণাত্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলে তিনি বিদ্রোহ করেন। সুলতান নিজেই তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তাকে পরাজিত করেন। তিনি আইন-উল-মুলককে ক্ষমা করে দেন এবং অন্য এক সম্মানজনক পদে নিযুক্ত করেন।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রতি আর কখনও সৌভাগ্য রবি সুপ্রসন্ন হয়নি। একের পর এক বিদ্রোহের শিখা প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে। ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উত্তর ভারতে সুলতান তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। ১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দে কাকাতীয় রাজপুত্র নায়ক দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য হিন্দু সামন্তদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। হয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লাল এতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ফলে দাক্ষিণাত্যের এক উল্লেখযোগ্য অঞ্চলে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে এবং স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে।

বস্তুত, এ সময় গুজরাট ও দেবগিরিতে সুলতানের কর্তৃত্ব বহাল ছিল। কিন্তু এ অঞ্চলও অল্পদিনের মধ্যে সুলতানের হাতছাড়া হয়ে যায়। দেবগিরির শাসনকর্তার অপসারণকে কেন্দ্র করে দেবগিরিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহী অভিজাতগণ নতুন শাসনকর্তাকে বন্দি করে কোষাগার লুট করে এবং দুর্গ দখল করে নেয়। এ অবস্থায় সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে দেবগিরিতে আসেন। কিন্তু কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বেই তিনি দেবগিরির বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব জনৈক সেনাপতির ওপর অর্পণ করে গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করতে ছুটে যান। এর ফলে বিদ্রোহী নেতা হাসান দাক্ষিণাত্যের গুলবর্গায় স্বাধীন বাহমনী রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করেন। ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ তিনি সুলতান আলাউদ্দিন বাহমান শাহ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতানের দেবগিরি ত্যাগের ফলে সারা দাক্ষিণাত্যই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। গুজরাটে এসেও সুলতান তেমন সুবিধা করতে পারেননি। গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করতে তিনি খুবই সচেষ্ট ছিলেন। বিদ্রোহীদের তাড়া করে তিনি সিন্ধুর থাট্টার দিকে অগ্রসর হন। এখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০শে মার্চ মৃত্যুবরণ করেন।

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষের দিকে কয়েক বছর সুলতানকে বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। সুলতানের ব্যর্থতা ও আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে সাম্রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা দেয়। এক বিদ্রোহ দমন করতে না করতেই আরেক বিদ্রোহের উদ্ভব হয়।সংস্কার প্রচেষ্টাগুলোর ব্যর্থতার কারণেই দীর্ঘ রাজত্বকালের শেষের দিকে তাঁকে এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল।

সারসংক্ষেপ

তুঘলক বংশের ইতিহাস উপমহাদেশের সামগ্রিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক এ বংশের অন্যতম সুলতান। তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বে দিল্লি সালতানাতের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। দাক্ষিণাত্যে, উড়িষ্যা এবং বাংলা অঞ্চলে তাঁর কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাঁরই পুত্র মুহাম্মদ বিন তুঘলক নানা কারণে আলোচিত চরিত্র। মুহাম্মদের রয়েছে অভ্যন্তরীণ নীতি, বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি

ক্ষেত্রে সাফল্য। মোঙ্গল আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষায় তিনি সফল হন। রাজত্বকালের দ্বিতীয় ভাগে তাঁকে বিদ্রোহ মোকাবেলা করতে হয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি পিছু হঠে আসেন। তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টাগুলোর ব্যর্থতা এবং আর্থিক দূর্বলতার কারণেই তুঘলক বংশের পতন ত্বরান্বিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোঙ্গল হামলা প্রতিহত করে অত্যন্ত জনপ্রিয় হন–
(ক) মুহাম্মদ বিন তুঘলক (খ) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক
(গ) ফিরোজ শাহ তুঘলক (ঘ) এঁদের কেউই নন।

২। উড়িষ্যা বিজয়ী জুনা খান হলেন–
(ক) মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র (খ) গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র
(গ) মুহাম্মদ বিন তুঘলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র (ঘ) গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

৩। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন–
(ক) ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে (গ) ১৪২৩ খ্রিস্টাব্দে।

৪। মুহাম্মদ বিন তুঘলক রাজত্ব করেন–
(ক) ২৬ বছর (খ) ১৬ বছর
(গ) ৬ বছর (ঘ) ৩৬ বছর।

৫। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন–
(ক) ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৩৫৩ খ্রিস্টাব্দে।

৬। মুহাম্মদ বিন তুঘলক মৃত্যুবরণ করেন–
(ক) ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৩৪৫ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। কিভাবে গাজি মালিক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকরেন?

২। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের প্রথম ভাগে বিদ্রোহ দমনের বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

২। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar (ed). *The History and Culture of the Indian People,* Vol-6 *Delhi Sultunate.*

২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*
৩। Agha Mehdi Hussain, *Tughlak Dynasty.*
৪। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা*, ২য় খন্ড।
৫। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*

পাঠ - ৪

মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বিভিন্ন পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পাঁচটি পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- পরিকল্পনাগুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

দিল্লির সুলতানদের মধ্যে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও সৃজনশীল চেতনার অধিকারী। রাজত্বের প্রথম দিকে তিনি কয়েকটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। যদিও এগুলো সফলতার আলো দেখতে পায়নি তবুও এগুলো তাঁর বাস্তব জ্ঞান ও সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে। সে যুগের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী সুলতানের পাঁচটি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো– (১) দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন; (২) খোরাসান অভিযান; (৩) কারাচিল অভিযান; (৪) প্রতীক মুদ্রার প্রচলন; (৫) দোয়াবে কর বৃদ্ধি।

দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন

মুসলিম অধিকারের সূচনালগ্ন থেকেই দাক্ষিণাত্য বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। নব সাম্রাজ্যভুক্ত সুদূর দাক্ষিণাত্যে মুসলিম জনসংখ্যার স্বল্পতা সে অঞ্চলের বিজিত অধিবাসীদের বিদ্রোহপ্রবণ করে তুলেছিল। সালতানাতের প্রাণকেন্দ্র দিল্লি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল অত্যন্ত জরুরি।

দিল্লি অপেক্ষা দেবগিরির কেন্দ্রীয় অবস্থান এবং দাক্ষিণাত্যের নৈকট্য দেবগিরিতে একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করতে সুলতানকে প্রণোদিত করেছিল। তাছাড়া দীর্ঘকালের উপর্যুপরি মোঙ্গল হামলা এবং কথিত বন্যার ফলে পাঞ্জাবের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এসকল বিষয় বিবেচনা করে অধিকতর মধ্যবর্তী স্থানে রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সামরিক ও রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এর মূলে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণও ছিল। দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপনের মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রসার ঘটানো সুলতানের একটি লক্ষ ছিল, কোন কোন ফার্সি উৎস গ্রন্থে এরকম উল্লেখ দেখা যায়।

সেকালের ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী উল্লেখ করেছেন যে, দেবগিরির অবস্থান ছিল সাম্রাজ্যের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় সমদূরবর্তী। বারাণী উল্লেখ করেছেন যে, সুলতান দেবগিরিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে দিল্লির ধ্বংস ডেকে আনেন। দিল্লিকে এমনভাবে জনশূন্য করা হয় যে, দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটা কুকুর বিড়ালও ছিল না।

যাহোক, সুলতান দেবগিরি যাত্রীদের জন্য সড়ক নির্মাণ ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। মানসিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি সহ্য করতে না পেরে অনেকেই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।

মরক্কো দেশীয় পর্যটক ইবনে বতুতা (আবু আবদুল্লা মুহাম্মদ ইবনে বতুতা) সুলতানের এ পরিকল্পনার কারণ হিসেবে এক অদ্ভুত কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে দিল্লির অভিজাত নাগরিকবৃন্দ সুলতানকে নেপথ্যে গালিগালাজ করতো এবং সুলতানের নিকট বেনামীতে অসভ্য ভাষায় চিঠি লিখতো। ফলে ক্রোধান্বিত সুলতান দিল্লি ধ্বংস করতে মনস্থ করেন। দিল্লির অধিবাসীদের শহর ত্যাগ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দেওয়া হয়। এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে সুলতানের নির্দেশে পরিচালিত অনুসন্ধানে একজন অন্ধ ও একজন খোঁড়া ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। এ ব্যক্তিদ্বয়কে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে দিল্লি হতে দেবগিরিতে পাঠানো হয়।

ইবনে বতুতার এই বক্তব্য শুধুমাত্র অতিরঞ্জন নয়, এটা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত। তিনি এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন। তাঁর বক্তব্যে স্ববিরোধিতা রয়েছে। ১৩৩৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি এসে দিল্লির আয়তন ও জনসংখ্যা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর মতে দিল্লি তখন ধনে-ঐশ্বর্যে এবং জনসংখ্যায় অন্যতম ছিল। আবার তিনিই বলেছেন যে দিল্লিকে চরমভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাই যদি হয়, তাহলে সাত, আট বছরের মধ্যে দিল্লিতে অনুরূপ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কি করে সম্ভব হয়েছিল?

সে সময়ের আরেকজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ইসামী (খাজা আবদুল মালেক ইসামী) তাঁর রচিত গ্রন্থে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের বিরুদ্ধে দিল্লি ধ্বংস ও দিল্লির অধিবাসীদের দেবগিরিতে নিয়ে যাবার অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এছাড়াও তিনি সুলতান সম্পর্কে অনেক অপ্রিয় বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসামীর পরিবার দিল্লি ত্যাগে বাধ্য হয়েছিল বলে সুলতানের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং এ ক্ষোভ স্বত:স্ফূর্তভাবে তাঁর লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে ইসামীর বর্ণনাও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়।

বস্তুত দিল্লিকে 'জনশূন্য' করার অভিযোগ অলীক কল্পনামাত্র। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় দিল্লি রাজধানীর মর্যাদাও হারায়নি। ১৩২৭ ও ১৩২৮ খ্রিস্টাব্দে দু'খানি সংস্কৃত লিপি হতে জানা যায় যে, সেকালের দিল্লির হিন্দু অধিবাসীদের অবস্থা ভাল ছিল এবং সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের প্রশংসাই করা হয়েছে। এর একটি লিপি কূপ খননের স্মারক হিসেবে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। যদি হিন্দুরা সুলতান কর্তৃক নিপীড়িত হতেন তথা দিল্লি ত্যাগ করতে বাধ্য হতেন, তাহলে পানীয় জলের জন্য কূপ খননের প্রয়োজন হতো না এবং সুলতানের প্রশংসাও লিপিবদ্ধ করা হতো না।

এছাড়া সুলতান দেবগিরিতে অবস্থানকালে মুলতানের শাসনকর্তা বাহরাম আইবা কিশলু খান বিদ্রোহ করেন। সুলতান স্বয়ং এ বিদ্রোহ দমন করার জন্য মুলতান যান।বিদ্রোহীদের পরাজিত করে প্রত্যাবর্তনকালে সুলতান "দারুল মুলক" (রাজধানী) দিল্লিতে অবস্থান করেন বলে ঐতিহাসিক ইয়াহিয়া বিন আহম্মদ তাঁর তারিখ-ই-মোবারকশাহী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অতএব, সংগতভাবেই মনে করা যেতে পারে যে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দিল্লি হতে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তর করেননি।দেবগিরিতে একটি নতুন বা দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করে তিনি সালতানাতের দক্ষিণ অঞ্চলে মুসলিম কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করতে এবং মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। দামেস্কের ঐতিহাসিক শাহাবউদ্দিন তাঁর 'মাহালিক-উল-আবসার' গ্রন্থে রাজধানী পরিবর্তনের কোন উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন যে, দিল্লি সালতানাতের দুটি রাজধানী ছিল (১) দিল্লি এবং (২) দেবগিরি। এ দুই রাজধানীর মধ্যে সুলতান সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন।একথা স্বীকার করতেই হবে যে পরিকল্পনাটি কোন একজন একনায়কের খেয়ালখুশীর ফসল নয়, রাজধানীর নিরাপত্তা বিধান ও সালতানাতের সুশাসন নিশ্চিত করতেই সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা স্থায়িত্ব লাভে ব্যর্থ হয়। সুলতানের সুগভীর আগ্রহ ও অর্থানুকূল্য সত্তেও অভিজাত শ্রেণী - ওলামা ও ওমরাহদের অসহযোগিতার ফলে সুলতান দিল্লি ফিরে আসতে বাধ্য হন। অবশ্য দাক্ষিণাত্যের বিরূপ জলবায়ুও এরজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। ঐতিহ্যমন্ডিত দিল্লি শহরের পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে দাক্ষিণাত্যের অজানা-অচেনা সমাজ ও প্রতিকূল পরিবেশ গ্রহণ করে নেয়ার মত মন মানসিকতা দিল্লির অভিজাত শ্রেণীর ছিল না বলেই পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয়।

তবে উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক দিক থেকে ব্যর্থ হলেও এর সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। দিল্লি হতে আসা ওলামাদের সকলেই দিল্লিতে ফিরে যাননি। যারা দেবগিরিতে থেকে যান তাদের প্রচেষ্টায় সেখানে মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠে এবং এমনকি পরবর্তী সময়ে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম রাজত্বও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খোরাসান অভিযান

বারাণী কর্তৃক উল্লেখিত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি ছিল খোরাসান অভিযান। সেকালে মধ্য এশিয়ায় বিরাজমান রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ পরিকল্পনা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত ছিল। বহুবিধ গুণের অধিকারী সুলতান একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন, সামরিক সংগঠন ও সামরিক অভিযানের প্রতি তাঁর তীব্র অনুরাগ ছিল। সিংহাসনে আরোহণের আগেও তিনি সামরিক ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুলতানের রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁর দরবারে আশ্রয় গ্রহণকারী কয়েকজন খোরাসানী আমীর তাঁকে খোরাসান আক্রমণ করতে আহ্বান জানান। বস্তুত, সে অঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থাও তখন আক্রমণের অনুকূলে ছিল। পারস্যের দুর্বল শাসক আবু সাঈদের অযোগ্যতার ফলে পারস্যের সীমান্তে তখন মোঙ্গল নেতা তারমাশিরীন এবং মিশরের সুলতান আন-নাসির হামলা চালাচ্ছিলেন। সম্ভবত: এ আক্রমণকারীদের সাথে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোন রকম যোগাযোগ ছিল। অতএব, এ অভিযানের পরিকল্পনা অবাস্তব বা অসম্ভব ছিল না।

এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুলতান ৩,৭০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনী ছিল সুলতানের নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও প্রাদেশিক শাসকদের অধীনস্থ বাহিনীর অতিরিক্ত। বারাণীর গ্রন্থে শুধুমাত্র সৈন্য সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। সৈনিকদের নিয়োগের শর্ত বা বেতন ভাতা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। অনুমান করা যেতে পারে যে নিয়োগের শর্তসমূহ অবশ্যই আকর্ষণীয় ছিল। অন্যথায় অত্যাল্প সময়ে এক বিশাল বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হতো না। বিপুল সংখ্যক রাজপুতসহ দেশী-বিদেশী বহুলোক এ বাহিনীতে যোগ দেয়।

দুর্ভাগ্যবশত খোরাসান অভিযানের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সম্পূর্ণ বাহিনী গঠিত হবার পরও সুলতান এ অভিযান বাতিল করতে বাধ্য হন। বারাণীর বর্ণনা মতে ৩,৭০,০০০ সৈন্য আরিজ-ই-মমালিকের দপ্তরে তালিকাভুক্ত হয়েছিল। পুরো এক বছর ধরে এ বিশাল বাহিনীকে নিয়মিত বেতন ভাতা প্রদান করা হয়। অবশ্য বারাণী এ অভিযান বাতিলের কোন কারণ উল্লেখ করেননি। তবে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনই এ পরিকল্পনা বাতিলের একমাত্র কারণ। সুলতানের প্রস্তুতি পর্বের শেষলগ্নে মিত্র জোটের এক সদস্য মোঙ্গল নেতা তারমাশিরীন বিদ্রোহী অভিজাতদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হলে মিত্র জোটে ভাঙ্গন ধরে এবং মিশরের সুলতান আন-নাসির ও পারস্য সম্রাট আবু সাঈদ–এর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হলে জোটের ভাঙ্গন পূর্ণতা লাভ করে। ফলে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক একা হয়ে যান।একজন বাস্তববাদী সমর নায়ক হিসেবে একাকী দূরদেশে অভিযানে যাওয়া অনুচিত বিবেচনা করে তিনি এ অভিযান পরিকল্পনা বাতিল করেন।

এতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় এবং ঐ বিশাল বাহিনী সালতানাতের জন্যে এক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সম্পূর্ণ বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া যেমন সম্ভব ছিল না। তেমনি সম্ভব ছিল না ঐ বাহিনীর নিয়মিতকরণ। বাহিনী ভেঙ্গে দিলে ব্যাপক অশান্তির সম্ভাবনা ছিল। আর নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থ যোগানের। এ সংকটের সমাধান হিসেবে সুলতান বাছাই করা ১০০,০০০ সৈন্য পরবর্তী অভিযানের জন্য রেখে বাকি সৈন্য বিদায় করে দেন।

কারাচিল অভিযান

সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের অপর পরিকল্পনা কারাচিল অভিযান। সম্ভবত: ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে এটি সংঘটিত হয়। বারাণীর মতে কথিত কারাচিল অভিযান ছিল খোরাসান অভিযানের অংশবিশেষ। তিনি মনে করেন যে খোরাসান আক্রমণে সেনাবাহিনীর চলাচল নিরাপদ করার জন্য সুলতান হিন্দুস্থান এবং চীনের মাঝে অবস্থিত পার্বত্য অঞ্চল দখল করতে মনস্থ করেন। কিন্তু এ বক্তব্য মোটেই ঠিক নয়। কারণ হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত কারাচিল কোনক্রমেই খোরাসান অভিযানের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিক ফিরিশতা সম্ভবত বারাণীর ভুল বুঝতে পারেন এবং সেটা সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটি ভুলের জন্ম দেন। কারণ তিনি কারাচিল অভিযানকে চীন অভিযানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক ফিরিশতার বক্তব্য গ্রহণ করে মনে করেন যে, সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক চীন দেশ আক্রমণ করেছিলেন এবং সে আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

মূলত কারাচিল অভিযান ছিল নগরকোট অভিযানের অংশ বিশেষ। পাঞ্জাবের কাংড়া জেলায় অবস্থিত নগরকোট নামক পার্বত্য দুর্গটি এ পর্যন্ত মুসলিম শাসনের বাইরে ছিল। ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক নাগরকোটে এক অভিযান প্রেরণ করেন। নাগরকোটের হিন্দু অধিপতি প্রাণপণে প্রতিরোধ করেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

নগরকোট অধিকারের পরপরই সুলতান কারাচিল অভিযানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারাচিল অভিযান কোন অলীক কল্পনা ছিল না। বস্তুত, বাস্তব রাজনৈতিক পরিকল্পনারূপেই কারাচিলে অভিযান প্রেরিত হয়। ইতোপূর্বেই সুলতানের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে পূর্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে সালতানাতের সীমান্ত সুরক্ষিত হয়েছিল। অতএব উত্তরাঞ্চলে সীমান্ত সুরক্ষার জরুরি প্রয়োজনেই তাঁকে কারাচিল অভিযান করতে হয়। এ অঞ্চলে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী হিন্দু রাজা রাজত্ব করতেন। তাকে দমন করা একান্তই প্রয়োজন ছিল। তদুপরি হিমালয় অঞ্চল তথা উত্তর সীমান্তে চীনা অভিযান বন্ধ করাও সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল। এ সকল কারণে তিনি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত হিন্দু রাজ্য কারাচিল আক্রমণ করেন।

কারাচিল অভিযানের জন্য সুলতান যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, দুর্গম অঞ্চলে এ অভিযান পরিচালনার জন্য তিনি খসরু মালিক নামক জনৈক যোগ্য সেনাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করেন। অভিযানের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করে সুলতান এর সাফল্য নিশ্চিত করতে সেনাপতিকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন কিছুদূর অগ্রসর হয়েই একটি করে চৌকি স্থাপন করেন– যাতে যোগাযোগ, সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত না হয়। সুলতানের নির্দেশিত ব্যবস্থাদি মেনে চলে সেনাপতি খসরু মালিক প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করেন, কিন্তু পরে তিনি নিজের খেয়াল খুশী মতো চলতে থাকলে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। দুর্ভাগ্যবশত: এ সময়ে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং সুলতানি বাহিনীতে মহামারীরূপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। চরম প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় সুলতানের বাহিনী পর্বতবাসী উপজাতিদের আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইবনে বতুতার মতে মাত্র ৩ জন এবং বারাণীর মতে মাত্র ১০ জন সৈন্য আত্মরক্ষা করে দিল্লি ফিরে যেতে সক্ষম হয়। দেখা যায় যে, সেনাপতির খামখেয়ালী এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সুলতানের এ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়।

প্রতীক মুদ্রার প্রচলন

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলককে যথার্থই মুদ্রা নির্মাতাদের যুবরাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি তাঁর রাজত্বকালে মুদ্রা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন এবং নতুন মানের মুদ্রা প্রবর্তন করেন। রাজত্বের প্রথম দিকে সুলতান মূল্যবান ধাতুসমূহের আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ এবং বিনিময় ব্যবস্থাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য মুদ্রা ব্যবস্থার সার্বিক সংস্কার সাধন করেন। কিন্ড় তাঁর প্রবর্তিত প্রতীক মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল নিঃসন্দেহে একটি মৌলিক ও সাহসী পদক্ষেপ। বারাণীর বিবরণ পড়ে মনে হয় যে, চরম আর্থিক সংকট নিরসন করার উদ্দেশ্য নিয়েই সুলতান প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন আর্থিক সংকটের কারণ না ফল– এটা বিবেচনার দাবি রাখে।

বারাণীর মতে সুলতানের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও অমিতব্যয়িতার ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে তাম্র মুদ্রা প্রচলন করতে বাধ্য হন। কিন্তু প্রতীক তাম্র মুদ্রার প্রবর্তন যে আর্থিক সংকটের ফল নয়– তা সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। বারাণীর বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে, প্রতীক মুদ্রা ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে সুলতান আসল নকল সকল প্রতীক মুদ্রা প্রত্যাহার করে নেন এবং সেগুলোর সমপরিমাণ অর্থ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রায় পরিশোধ করেন। আর্থিক সংকটের কারণে প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন করা হলে ঐ মুদ্রা প্রত্যাহার করে সমমূল্য প্রদান করা সুলতানের পক্ষে অবশ্যই সম্ভব হতো না।

অতএব দেখা যায় যে, বারাণীর উল্লেখিত আর্থিক সংকট প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তনের কারণ নয়। সম্ভবত দুটি কারণে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন করতে উৎসাহী হয়েছিলেন। প্রথমত, মধ্যযুগে ভারতসহ পৃথিবীর সর্বত্রই রৌপ্যের অভাব দেখা দেয়। চতুর্দশ শতকে ভারতে যে রৌপ্যের অভাব ছিল তা সুলতানের মুদ্রা সংস্কার হতেই প্রমাণিত হয়। সুলতান স্বর্ণ মুদ্রার ওজন বৃদ্ধি ও রৌপ্যমুদ্রার ওজন হ্রাস করেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, রাজকোষ শূন্য ছিল না এবং স্বর্ণের তুলনায় রৌপ্যের সরবরাহ কম ছিল। এ সময় প্রায়ই রৌপ্য মুদ্রার মূল্যমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এ সময় মুদ্রার চাহিদাও বহুলাংশে বেড়ে যায়। বিশাল সেনাবাহিনী নিয়োগের ফলে সমস্যা প্রকটতর হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, জ্ঞান প্রদীপ্ত সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক নিঃসন্দেহে উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ছিলেন।তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভালোবাসতেন। তার আগে থেকেই চীন ও পারস্যে কাগজ ও চামড়ার মুদ্রা প্রচলিত ছিল।এ উদাহরণ তাঁকে রূপার অভাবজনিত সমস্যা মোকাবেলায় তামার মুদ্রা প্রবর্তন করতে উৎসাহিত করে। প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার সমমূল্যে তাম্রমুদ্রা জারি করা হয়।

প্রতীক তাম্র মুদ্রা প্রবর্তন সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। নতুন মুদ্রা প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি, সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রশাসন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। জনসাধারণকে ধোকা বা ফাঁকি দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। কিন্তু সুলতানের সদিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর এ মহতী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

এ ব্যর্থতার মূলে অনেকগুলো কারণ ছিল। প্রথমত, নব প্রবর্তিত এ প্রতীক তাম্রমুদ্রা উৎকীর্ণ করার ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অর্থাৎ মুদ্রা যাতে জাল করা সম্ভব না হয় সেরকম কোন ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করেননি। ফলে প্রায় ঘরে ঘরে তাম্র মুদ্রা তৈরি হতো। বারাণী উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি হিন্দুর ঘরই একটি টাকশালে পরিণত হয়েছিল। দেশব্যাপী হিন্দুগণ অগণিত জাল তাম্রমুদ্রা তৈরি করে। তাম্র মুদ্রা ব্যাপক হারে জাল হবার ফলে মূল্যবান ধাতু নির্মিত মুদ্রাসমূহ বাজার হতে উধাও হয়ে যায়। জনগণ তাম্র মুদ্রা দিয়ে রাজস্ব প্রদান করে এবং এর দ্বারা অস্ত্র, অশ্ব এবং মূল্যবান সামগ্রীসমূহ ক্রয়করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে। ক্রমে ধাতু মুদ্রার অভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে ধ্বস নামে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার প্রচলিত অস্থিতিশীলতা এ ব্যবস্থার ব্যর্থতার আরেকটি কারণ। স্থিতিশীল রাষ্ট্রতন্ত্রের পূর্ণ দায়িত্ব ছাড়া প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তনের মত কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। পূর্ববর্তী খলজী শাসক আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬) অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই সে ব্যবস্থা বিলীন হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, যে কোন অর্থনৈতিক বা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সফলতার জন্য জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। চতুর্দশ শতকের ভারতীয় জনগণের মন-মানসিকতা ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং সংস্কার বিরোধী। ফলে চতুর্দশ শতকের ভারতে প্রতীক মুদ্রার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। সুলতানের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন জনসাধারণ তামাকে তামা হিসেবেই বিবেচনা করেছে, মুদ্রা হিসেবে নয়।

দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আরেকটি পরিকল্পনা ছিল দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করা। গঙ্গা, যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল ছিল সালতানাতের সর্বাপেক্ষা উর্বর অঞ্চল। এ অঞ্চলে পানি সরবরাহের অভাব না থাকায় প্রচুর শস্য উৎপাদন হতো; এবং বলতে গেলে দোয়াব ছিল সালতানাতের শস্যভান্ডার। বস্তুত,

দোয়াব অঞ্চলে ভূমির উর্বরতা এবং সম্পদের প্রাচুর্য সুলতানকে ঐ অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করতে আগ্রহী করে তোলে। খোরাসান ও কারাচিল অভিযানের বিপুল ব্যয় এবং প্রতীক তাম্র মুদ্রা ব্যর্থ হওয়ায় সুলতানের কোষাগার প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়েই তিনি সালতানাতের সবচেয়ে সম্পদশালী দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি করেন।

সমকালীন ঐতিহাসিক ইসামী বা মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা দোয়াবে কর বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছুই লিখেননি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বিষয়টির প্রতি তাঁরা তেমন গুরুত্ব প্রদান করেননি। একমাত্র ঐতিহাসিক বারাণীই (দোয়াব অঞ্চলের অধিবাসী) এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে সুলতান দোয়াব অঞ্চলে ১০ গুণ বা ২০ গুণ কর বৃদ্ধি করেন। ফলে রায়তগণ বাড়ি-ঘর ছেড়ে বনে বাদাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতানের সেনাবাহিনী সেখানেও তাদের তাড়া করে হত্যা করে।

বারাণীর এরূপ বক্তব্য নিতান্তই অতিরঞ্জিত এবং সুলতানের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও বিদ্বেষের বহি:প্রকাশ বলে আধুনিক পন্ডিতগণ মনে করেন। সম্ভবত ঐ কর বৃদ্ধির ফলে বারাণীর গ্রামবাসী এবং আত্মীয়-স্বজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। যাহোক দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি নতুন কিছু নয়। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীও দোয়াবে কতিপয় আবওয়াবসহ (নির্ধারিত খাজনার অতিরিক্ত দেয় কর) ৫০% কর আরোপ করেছিলেন এবং অত্যন্ত কঠোরতার মাধ্যমে তা আদায় করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব অঞ্চলে কি হারে কর বাড়িয়েছিলেন, বারাণী তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। তাঁর কথিত ১০ গুণ বা ২০ গুণ কর বৃদ্ধি একেবারেই অসম্ভব; হতে পারে যে সুলতান ১০% বা ২০% কর বৃদ্ধি করেছিলেন। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজত্বের প্রায় সব ক্ষেত্রেই দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছিলেন, খোরাসান অভিযানের জন্য গঠিত বিশাল সেনাবাহিনীতে দোয়াব অঞ্চলের বহুলোক যোগ দিয়েছিল। সে বাহিনী ভেঙ্গে দেবার পর তারা দোয়াবেই ফিরে যায়। ফলে আঞ্চলিক অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। দোয়াব অঞ্চলে তখন এক প্রকার দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছিল। এরকম অবস্থায় কর বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে। ফলে দোয়াবের প্রজাগণ অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহ করে এবং কর আদায়কারীদের হত্যা করে। তারা নিজেদের শস্য পুড়িয়ে বনে বাদাড়ে আশ্রয় নেয়।এতে অবস্থার অবনতি ঘটে। এবং ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আশংকা দেখা দেয়। দোয়াবের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সুলতান বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সুলতানের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন জনসাধারণ এ পদক্ষেপকে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য করে। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহাসিক বারাণী স্বাভাবিক কারণেই বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে অবগত হয়ে সুলতান তাৎক্ষণিকভাবে কিছু ত্রাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এগুলোর মধ্যে কূপ খনন এবং 'তাকাভী' ঋণ প্রদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সুলতানের গৃহীত ব্যবস্থাগুলো অবস্থার তেমন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বহুলোক মারা যায়।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কল্যাণকামী পরিকল্পনাগুলো দুর্ভাগ্যের অশুভ শক্তির প্রভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুলতান ব্যর্থ হন বটে, কিন্তু এ ব্যর্থতার জন্য তাঁকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা যায় না। একটি ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের অসংখ্য সমস্যার মোকাবেলা তাঁকে করতে হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই সুলতানের কর্মচারীরা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেনি বা প্রয়োজনমত সহযোগিতা দান করেনি। এটি অনস্বীকার্য যে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। আর এ ব্যর্থতার মূলে ছিল প্রায় ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা।

দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করে দাক্ষিণাত্যে মুসলিম অধিকার দৃঢ় করার ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রসার ঘটানোর প্রচেষ্টায় সুলতানের বাস্তব চিন্তারই পরিচায়ক। কিন্তু পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করতে গিয়ে সুলতানের পদক্ষেপ, বিশেষ করে দিল্লি থেকে কর্মচারীদের সপরিবারে স্থানান্তরে বাধ্য করার বিষয়ে কিছুটা অবাস্তবতা ছিল বলে মনে করা যায়। কারাচিল ও খোরাসান অভিযান মধ্যযুগের যে কোন নরপতিরই স্বাভাবিক কার্যক্রম বলে মনে করা যায়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন সুলতানকে একটি অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। অন্যটি প্রতিকূল অবস্থার জন্য ব্যর্থ হয়। এসব সামরিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা অর্থাভাবের কারণ হয়ে থাকতে পারে। ফলে রাজ্যের সবচেয়ে উৎপাদনক্ষম অঞ্চলে কর বৃদ্ধির মধ্যে তেমন

কোন অবাস্তবতার লক্ষণ নেই। তাম্র মুদ্রা প্রচলনের প্রচেষ্টা অবশ্যই সুলতানের যুগের তুলনায় অগ্রসর চিন্তার পরিচয় বহন করে। তবে তাম্র মুদ্রার নকল রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ না করা অবশ্য সুলতানের ব্যর্থতার পরিচায়ক। প্রত্যেকটি পরিকল্পনাই সুলতানের সদুদ্দেশ্যের পরিচয় বহন করে। সমসাময়িক জনগণ তাঁকে অনেক ভুল বুঝেছে। একের পর এক ব্যর্থতা দিল্লি সালতানাতের জন্য দুর্যোগই বয়ে এনেছিল।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ভারতে শাসনকারী প্রতিটি বংশেই একজন করে অতি বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। প্রাথমিক তুর্কি বংশের কর্মবীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন, খলজী বংশের দুঃসাহসী রাজনৈতিক-অর্থনীতিবিদ আলাউদ্দিন খলজী এবং করৌনা তুর্কি বংশে আদর্শবাদী সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ইতিহাসের পাতায় অমর-অক্ষয় হয়ে আছেন।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক সুগঠিত শরীর ও সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। খেলাধুলা, অশ্বারোহণ, অস্ত্র পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্থ সুলতান ব্যক্তিগত জীবনে সফল এবং পাপাচার থেকে মুক্ত ছিলেন। বিনীত স্বভাব ও ন্যায়পরায়ণতা তাঁর চরিত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও শিক্ষকদের প্রতি তিনি বিশ্বস্ত এবং তাঁর মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দরবারের অনুষ্ঠানে আড়ম্বরতা পছন্দ করলেও ব্যক্তিগত আচার-আচরণে ছিলেন সহজ, সরল ও সংযমী। তিনি মদ পান করতেন না, নৈতিকতা বর্জিত ক্রিয়াকান্ডে জড়িত লোকদের সংস্পর্শ তিনি এড়িয়ে চলতেন। তিনি প্রজাদের জন্য মদপান নিষিদ্ধ করেছিলেন। কামনা-বাসনায় সুলতান ছিলেন অত্যন্ত সংযত। আওরঙ্গজেবের মত গোঁড়া ও নাসিরউদ্দিনের মত কৃচ্ছ্রবান না হলেও সুলতান আচার-আচরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

শাসক হিসেবে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক উদার, দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিকগণ তাঁর দানশীলতার প্রশংসা করেছেন। আলাউদ্দিন খলজীর মত তিনি প্রশাসনিক কাজে আলেম সমাজকে এড়িয়ে চলেছেন এবং শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজের চিন্তা-চেতনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কারণে কোন কোন গোঁড়া ঐতিহাসিক তাঁকে অধার্মিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এ অভিযোগ মোটেও সত্য নয়। তিনি ধর্মভীরু ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় নীতিসমূহ মেনে চলতেন। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান যারা পালন করতো না, তাদের শাস্তি দিতেন। কিন্তু তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি হিন্দুদের প্রতি উদার ও সহনশীল ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত 'সতীদাহ' প্রথা বন্ধ করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। উদারতা ও সহনশীলতার দিক থেকে তাঁকে মহামতি আকবরের পূর্বসুরী বলা যেতে পারে।

মুসলিম বিজয়ের সূচনালগ্ন থেকে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণকারী নরপতিদের মধ্যে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন নিঃসন্দেহে সবার চেয়ে জ্ঞানী ও মার্জিত। অতুলনীয় স্মরণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী সুলতান সমকালীন ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ তাঁকে সেকালের এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল।

ইবনে বতুতা এবং তাঁর বর্ণনা অনুসরণ করে কতিপয় ঐতিহাসিক সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলককে রক্তপিপাসু ও নিষ্ঠুর বলে অভিযুক্ত করেছেন।এ অভিযোগ যথার্থ নয়। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক রয়েছে সত্য– কিন্তু তা যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়নি। বিদ্রোহীদের তিনি কঠোরভাবে দমন করেছেন এবং নির্মম শাস্তি দিয়েছেন। সে যুগের প্রচলিত ব্যবস্থা হিসেবেই তিনি তা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুলতান আলাউদ্দিনের দন্ডপ্রথার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালে প্রায় সারা বিশ্বেই দন্ডপ্রথা কঠোর ছিল। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক ওলামা বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বহু শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারাই অতিরঞ্জিতভাবে সুলতানের নিষ্ঠুরতার কথা লিখেছেন।

সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন এবং প্রজাদের কল্যাণ সাধনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল। এমনকি শত্রুর প্রতিও তিনি ঔদার্য্য প্রদর্শন করেছেন। অভাব ও দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ব্যাপক সাহায্য প্রদান করা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় জলসেচের ব্যবস্থা এবং ভূমি উদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে কৃষি ব্যবস্থাকে জোরদার করে তুলেছিলেন।

আধুনিককালের কোন কোন ঐতিহাসিক সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গিতে সুলতানের কার্যকলাপের বিচার করতে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে পাগলামীর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু সমকালীন ঐতিহাসিকদের লেখনিতে এ ধরনের বিন্দুমাত্র আভাস-ইঙ্গিতও নেই। এক্ষেত্রে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণই অগ্রগামী ভূমিকায় রয়েছেন। বারাণী তাঁকে 'সৃষ্টির যথার্থ বিস্ময়, বিপরীতমুখী গুণাবলীর এক বিরল সমন্বয় বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনে বতুতা তাঁকে রক্তপিপাসু বলে উল্লেখ করলেও কখনো তাঁকে পাগল বা উম্মাদ বলেননি।

তাঁর রাজত্বকালেই সালতানাতের পতন শুরু হয়। তাঁর গড়া সাম্রাজ্য তাঁর চোখের সামনেই ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। এজন্য তাঁকে সম্পূর্ণরূপে দায়ী করা যায় না। বাস্তব বিচারবুদ্ধি বর্জিত বলে তাঁকে অভিযুক্ত করাও ঠিক নয়। সারা জীবন তিনি প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং তিনি কখনো হতাশ হননি। এটা সত্য যে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁর ব্যর্থতার জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতা যার ওপর তাঁর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এক দশকব্যাপী স্থায়ী দুর্ভিক্ষ তাঁর শাসনামলের গৌরব ম্লান করে দেয় এবং তাঁর প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলে।তাঁর রাজত্বের শেষার্ধে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু রাজাদের বিদ্রোহ মূলত আলাউদ্দিন খলজীর বিজয় ও লুণ্ঠনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই দেখা দিয়েছিল। বিদ্রোহী বাংলা বরাবরই দিল্লির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিল। ক্রমবর্ধমান একটি সাম্রাজ্যের সার্বিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত ছিলেন। ফলে সুন্দর আদর্শ ও অফুরন্ত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, একথা স্বীকার করতেই হয়।

সার সংক্ষেপ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। এই সুলতানের পাঁচটি পরিকল্পনা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। দিল্লি থেকে সরিয়ে দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন তুঘলকের প্রথম পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা স্থায়িত্ব পায়নি এবং ব্যর্থ হয়। তবে এর ধর্ম-সামাজিক প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। মুহাম্মদের দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল খোরাসান অভিযান। এ অভিযানে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। কারাচিল অভিযানের পরিকল্পনা বেশ জোরালোভাবে গৃহীত হলেও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার জন্য এটিও ব্যর্থ হয়ে যায়। পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে প্রতীক তাম্র মুদ্রার প্রচলন তুঘলকের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। এতদ্সত্ত্বেও এ মহতী পরিকল্পনাটিও ব্যর্থ হয়। অবশ্য এ ব্যর্থতারও অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ ছিল। দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি তুঘলকের অপর একটি পরিকল্পনা। এই কর বৃদ্ধি দোয়াবের প্রজাদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। শোনা যায়, এ সময় দোয়াবে দুর্ভিক্ষও দেখা দিয়েছিল। সুলতানের সব কয়টি পরিকল্পনা সদুদ্দেশ্যে গৃহীত হলেও তা সফল হয়নি। এই ব্যর্থতা দিল্লি সালতানাতের জন্য দুর্যোগ বয়ে আনে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোথায় রাজধানী স্থানান্তর করা হয়?

(ক) কারাচিলে (খ) দেবগিরিতে

(গ) নগরকোটে (ঘ) খোরাসানে।

২। কারাচিল অভিযান ব্যর্থতার প্রধান কারণ কি?

(ক) দূরত্ব (খ) দুর্গম অঞ্চল

(গ) অর্থ সংকট (ঘ) প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা।

৩। দোয়াব অঞ্চল কোথায় অবস্থিত?
(ক) গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে (খ) নর্মদা নদীর তীরে
(গ) ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে (ঘ) সিন্ধু নদের তীরে।

৪। দোয়াবে কর বৃদ্ধি প্রসঙ্গে কার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে?
(ক) ইবনে বতুতা (খ) জিয়াউদ্দিন বারাণী
(গ) ইসামী (ঘ) ইয়াহিয়া বিন আহম্মদ।

৫। মুহাম্মদ বিন তুঘলক 'রক্ত পিপাসু ও নিষ্ঠুর' ছিলেন– কার উক্তি?
(ক) ইবনে বতুতা (খ) জিয়াউদ্দিন বারাণী
(গ) ইসামী (ঘ) শামস-ই-সিরাজ আফিফ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

২। 'প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তন' পরিকল্পনাটি ব্যর্থতার কারণগুলো নির্ণয় করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র ব্যাখ্যা করুন। দিল্লির সুলতানি শাসনের পতনের জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন?

২। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন প্রতিভা ও অসামঞ্জস্যের এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ– ব্যাখ্যা করুন।

৩। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনাগুলোর সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। R.C. Majumdar (ed). *The History and Culture of the Indian People,* Vol-*Delhi Sultunate.*

২। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

৩। Agha Mehdi Hussain, *Tuglilak Dynasty.*

৪। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা*, ২য় খন্ড।

৫। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*

পাঠ - ৫

ফিরোজ শাহ তুঘলক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজ্য বিজয়ের বিবরণ দিতে পারবেন ;
- ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন ;
- ফিরোজ শাহ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সিন্ধুতে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে থাট্টায় ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে মার্চ মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে বিশৃংখলা দেখা দেয়। নেতৃত্বের অভাবে সৈন্যদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয় এবং সৈন্যবাহিনীর বেতনভুক মোঙ্গল সৈন্যরা লুটতরাজ শুরু করে। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না এবং বারাণী বলেছেন যে তিনি কাউকে উত্তরাধিকারীও মনোনীত করে যান নি। ফলে দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারের কোনো নিশ্চয়তা না থাকায় এই বিশৃংখলা আরো গুরুতর আকার ধারণ করে। এ রকম দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সেনানায়ক ও আমীররা মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পিতৃব্য-পুত্র ফিরোজ শাহকে সিংহাসনে আরোহণের অনুরোধ জানায়। তাদের পীড়াপীড়িতে ও সাম্রাজ্যের শৃংখলা রক্ষার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরোজ শাহ সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফলে সৈন্যবাহিনীতে শৃংখলা ফিরে আসে। ইতোমধ্যে দিল্লিতে ওয়াজির খান জাহান আহম্মদ বিন আয়াজ পরলোকগত সুলতানের পুত্ররূপে পরিচয় দিয়ে ছয় বছর বয়সী একজন বালককে গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক দিল্লির দিকে অগ্রসর হলে খান জাহান আত্মসমর্পণ করেন। ফিরোজ শাহ, খান জাহানকে সামানার গভর্নর নিযুক্ত করেন, কিন্তু সামানা যাওয়ার পথে তিনি নিহত হন।

১৩৫১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনের প্রতি তাঁর কোন লোভ ছিল না, সিংহাসনের জন্য তিনি উপযুক্তও ছিলেন না।তবে তাঁর সুদীর্ঘ ৩৭ বছরের রাজত্বকালে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কম ছিল, দেশে কোন দুর্ভিক্ষ বা মহামারী দেখা যায়নি, কোনো বড় আকারের বিদেশী আক্রমণও ঘটেনি।

প্রায় দুই যুগ ধরে কিয়ামুল-মুলক খান জাহান আজম হুমায়ুন ওয়াজির হিসেবে ফিরোজ শাহের অধীনে দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করে তিনি ওয়াজির খান জাহানের অধীনে নায়েব- ওয়াজির হয়েছিলেন। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে তিনি ওয়াজির পদে নিযুক্ত হন। তাঁর দক্ষতার জন্য ফিরোজ শাহ তাকেই 'দিল্লির প্রকৃত মুসলমান' রূপে অভিহিত করেন।

বাংলা অভিযান

বিজেতা ও সেনাপতি হিসাবে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে স্বাধীন হয়ে যাওয়া কয়েকটি রাজ্য তিনি পুনর্দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৩৫৩-৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। বাংলায় পৌঁছে ফিরোজ শাহ সে দেশের ওপর তাঁর আইনগত অধিকার ও ইলিয়াস

শাহের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে একটি ইশতেহার জারি করেন। বাংলার জনসাধারণকে নিজ পক্ষে আনার জন্য তিনি তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা দানেরও ঘোষণা দেন। ইলিয়াস শাহ ফিরোজ শাহের বাংলা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ পান্ডুয়া দখল করে সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। কিছুদিন পর ফিরোজ শাহ দিল্লি ফিরে যাবার ভান করে পিছু হটতে থাকলে ইলিয়াস শাহ দুর্গ থেকে বের হয়ে দিল্লি বাহিনীকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং ইলিয়াস শাহ আবার একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক একডালা দুর্গ অবরোধ করেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে দুর্গের ভিতরের মুসলমান রমণীদের কান্না শুনে ফিরোজ শাহ দুর্গ দখল না করেই দিল্লি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ফিরোজ শাহ পান্ডুয়া ফিরে আসেন পরে তিনি দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন। নিরপেক্ষভাবে বলা যায় যে, ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রথম বাংলা অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল।

১৩৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহ মৃত্যুবরণ করেন। ১৩৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ আবার বাংলা দখলের উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলা আক্রমণ করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ৭০,০০০ অশ্বারোহী, ৪৭০ টি হাতি, অনেক রণতরী এবং অসংখ্য পদাতিক সৈন্য ছিল। বাংলার সুলতান সিকান্দার শাহ পিতার মত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক দিন ধরে দুর্গ অবরোধ করেও ফিরোজ শাহ তা দখল করতে পারেন নি। দীর্ঘ দিনের নিস্ফল অবরোধে উভয় পক্ষেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং তাঁদের মধ্যে সন্ধি হয়। তাই দেখা যায় যে, ফিরোজ শাহ দুবার বাংলা আক্রমণ করলেও তা নিজ দখলে আনতে ব্যর্থ হন।

অন্যান্য রাজ্য আক্রমণ

বাংলা থেকে দিল্লি ফিরে আসার পথে ফিরোজ শাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। আগে জাজনগর দিল্লির বশ্যতা স্বীকার করেছিল এবং নিয়মিত কর হিসেবে দিল্লিতে হাতি পাঠাতো। কিন্তু ফিরোজ শাহের দ্বিতীয়বার বাংলা অভিযানের সময় জাজনগরের রাজা বাংলার পক্ষে যোগদান করেছিলেন। দিল্লি বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আফিফের পিতা জাজনগরকে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী দেশরূপে বর্ণনা করেছেন। মুসলমানদের আক্রমণে ভীত হয়ে জাজনগরের রাজা পালিয়ে যান এবং পরে সন্ধি করতে বাধ্য হন। রাজা প্রতি বছর দিল্লির সুলতানকে কয়েকটি হাতি পাঠাতে অঙ্গীকার করেন। এবং সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে দিল্লি ফিরে আসেন। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরটি ধ্বংস করা হয় এবং ঐ মন্দিরের জগন্নাথদেবের মূর্তিটি দিল্লি নিয়ে আসা হয়।

১৩৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ নগরকোট আক্রমণ করেন। মধ্যযুগের ভারতে নগরকোট ছিল এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বলা হয়েছে যে "নগরকোট নগরটি ছিল পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এবং এর দুর্গটির নাম কাংড়া"। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩৩৭ খ্রিস্টাব্দে নগরকোট জয় করেছিলেন। কিন্তু

তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে নগরকোটের রাজা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফিরোজ শাহের নগরকোট আক্রমণের এটাই ছিল প্রধান কারণ। নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দির অতি প্রাচীন কাল থেকেই অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। এটা ছিল অত্যন্ত পুরনো মন্দির এবং অসংখ্য হিন্দু প্রত্যেকদিন এ মন্দিরে পূজা করতে যেতো এবং ধন-রত্ন উপহার দিতো। ফিরোজ শাহ তুঘলকের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে নগরকোটের রাজা দুর্গে আশ্রয় নেন। প্রায় ছয় মাস দুর্গ অবরোধের পর দুপক্ষের মধ্যে সন্ধি হয়। রাজা দুর্গের বাইরে এসে সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সুলতান রাজাকে বহুমূল্যবান খেলাত প্রদান করেন। নগরকোটের মন্দির থেকে ফিরোজ শাহ ৩০০ মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে আসেন এবং আজউদ্দিন নামে তাঁর এক সভাকবি দালাইল-ই-ফিরোজশাহী শিরোনামে ফার্সিতে অনুবাদ করেন।

সিন্দুর বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে মুহাম্মদ বিন তুঘলক প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এর প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১৩৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু আক্রমণ করেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে সিন্ধুর স্থানীয় নেতৃবর্গের বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ দমন করে সেখানে দিল্লির সুলতানের নিরঙ্কুশ আধিপত্য পুন:প্রতিষ্ঠা করা ছিল ফিরোজ শাহের সিন্দু অভিযানের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি সিন্ধুর 'জাম' (শাসক) -এর রাজধানী থাট্টা অবরোধ করেন। সিন্দুর 'জাম' বাবিনিয়া তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সুলতানকে প্রতিহত করতে থাকেন। মহামারীতে দিল্লি বাহিনীর তিন-চতুর্থাংশ ঘোড়া মারা যায় এবং সৈন্যবাহিনীতেও খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এ অবস্থায় সুলতান গুজরাটের দিকে অগ্রসর হন। গুজরাটের শাসনকর্তা (গভর্নর) নিজামুল মুলক আমীর হোসেন ছিলেন সুলতানের ভগ্নিপতি। গুজরাটে এসে সুলতান আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে খান জাহানও দিল্লি থেকে অনেক সৈন্য ও বিপুল রণসম্ভার পাঠান। সিন্ধুর শাসক ভীত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁকে দিল্লি নিয়ে আসা হয়। তবে সিন্ধুকে সাম্রাজ্যভুক্ত না করে পূর্ববর্তী শাসকের ভাই-এর হাতে এর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। ড. বানারসী প্রসাদ সাক্সেনার মতে সমগ্র দিল্লি সালতানাতের ইতিহাসে এটি ছিল সবচেয়ে অব্যবস্থিত সামরিক অভিযান।

জনহিতকরণ কার্যাবলী

বিজেতা ও সেনাপতি হিসাবে ফিরোজ শাহের সাফল্য অত্যন্ত সীমিত। তবে প্রজাহিতৈষী সুলতানরূপে তিনি ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেছেন। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি বহুবিধ সংস্কার সাধন করেছিলেন। শাসনকাজে তিনি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি শরিয়তের বিধি অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং সব সময়ই আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মিশরের খলিফার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি দুবার খলিফার কাছ থেকে সনদ লাভ করেছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ছিলেন সুন্নি মুসলমান, শিয়াদের তিনি পছন্দ করতেন না। এটা বিস্ময়কর যে রাজপুত মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেও ফিরোজ শাহ অমুসলমানদের প্রতি তেমন উদারতা দেখাতে পারেননি। অন্য ধর্মাবলম্বীদের তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন– তবে তাদের ওপর তিনি অত্যাচার করেননি। তিনি হিন্দুদের উপর পুনরায় জিজিয়া কর আরোপ করেছিলেন।

জনগণের দুর্দশা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি মুহাম্মদ বিন তুঘলক কর্তৃক প্রজাদেরকে প্রদত্ত ঋণের টাকা মওকুফ করে দেন। পূর্ববর্তী সুলতানের আমলে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণকে তিনি ক্ষতিপূরণ দান করেন।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজীর সময় জায়গীর প্রথা রদ করা হয়েছিল। সুলতান ফিরোজ শাহ তা আবার প্রবর্তন করেন। আমীর ও কর্মকর্তাদের মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়। সমস্ত সাম্রাজ্যকে জায়গীরে বিভক্ত করে কর্মকর্তা ও আমীরদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সুলতানের কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ড় এটা সাম্রাজ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়েছিল।

সুলতান প্রজাদের কল্যাণের জন্য বেশ কিছু প্রশংসনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কৃষির উন্নতিকল্পে তিনি বহু কর রহিত করেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে সুলতান ২৩ ধরনের অবৈধ কর রহিত করেছিলেন এবং শরিয়তের বিধান অনুযায়ী 'খারাজ' বা ভুমি রাজস্ব (জমির ফসলের এক-দশমাংশ), 'যাকাত' বা গরীবদের সাহায্যার্থে সরকারি তহবিলে দান (২১/২%), 'জিজিয়া' বা অমুসলমানদের ওপর ধার্যকৃত কর ও 'খামস' বা খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ কর আরোপ করেছিলেন। এ ছাড়া সেচকর এবং যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির এক-পঞ্চমাংশ প্রভৃতিও ছিল রাজ্যের আয়ের উৎস। পূর্বের বহু অবৈধ কর থেকে তিনি প্রজাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। সুলতানের এসব ব্যবস্থার ফলে রায়ত ও চাষীদের অবস্থার উন্নতি ঘটে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমে যায় এবং দেশে কখনো অভাব দেখা যায় নি।

অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আন্তঃপ্রাদেশিক শুল্ক উঠিয়ে দেন। ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অবাধ বাণিজ্য পরিচালনায় সুবিধা হয়, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তিনি মুদ্রানীতির সংস্কার করে এটাকে বিজ্ঞানসম্মত করেন। তিনি 'আধা' ও 'বিখ' নামে দুটি মুদ্রার প্রচলন করেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক বহু সেচ-খাল খনন করিয়েছিলেন যার ফলে কৃষির উন্নতি ঘটে ও বহু পতিত জমি আবাদ হয়। এগুলোর মধ্যে যমুনা খাল এখনও বিদ্যমান। তাঁর এসব ব্যবস্থার সুফল বর্ণনা করে আফিফ

লিখেছেন যে প্রজাদের ঘর খাদ্য-শস্য, ধন-রত্ন, ঘোড়া এবং আসবাবপত্রে পূর্ণ ছিল। সবারই ছিল প্রচুর সোনা-রূপা। জনগণ সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতো।

নির্মাতা হিসাবেও ফিরোজ শাহ তুঘলক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বহু শহর ও বাগান নির্মাণ করেছিলেন। জৌনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার, বাদাউনের কাছে ফিরোজপুর ও দিল্লির কাছে ফিরোজাবাদ ইত্যাদি শহরগুলো তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা, মসজিদ, প্রাসাদ, সরাইখানা, হাসপাতালও নির্মাণ করেছিলেন। আফিফের মতে ফিরোজ শাহ নয়টি প্রাসাদ ও সাতটি বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। আলাউদ্দিন খলজীর নির্মিত ত্রিশটি বাগান তিনি সংস্কার করেছিলেন এবং নিজে ১২০০ নতুন বাগান তৈরি করেছিলেন। এসব বাগান থেকে খরচ বাদ দিয়ে রাজকোষে বছরে ১,৮০,০০০ তঙ্কা আয় হতো। অশোকের নির্মিত দুটি স্তম্ভ সুলতান ফিরোজ শাহ দিল্লিতে নিয়ে আসেন এবং এগুলোর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। এগুলোর একটি মীরাট ও অন্যটি খিজিরাবাদ থেকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন।

সংস্কারমূলক কার্যাবলী

ফিরোজ শাহ বিচার ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। পূর্ববর্তী আমলের অনেক নিষ্ঠুর প্রথা তিনি রহিত করেন। বিচারের ব্যাপারে সুলতান কোরআনের অনুশাসন মেনে চলতেন, মুফতি আইনের ব্যাখ্যা করতেন এবং কাজি শাস্তির হুকুম দিতেন। আগে শাস্তি হিসাবে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদ করা হতো যা তিনি রহিত করে শাস্তির কঠোরতা হ্রাস করেন।

বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি একটি কর্মসংস্থান সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। কোতোয়াল বেকারদের তালিকা তৈরি করে পাঠাতেন এবং তাদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী তাদের চাকুরি বা জীবিকার ব্যবস্থা করা হতো। সুলতান নিজে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং জনসাধারণের উপকারার্থে দিল্লিতে একটি দার-উশ-শিফা বা হাসপাতাল নির্মাণ করেন। সেখানে দেশ-বিদেশের দক্ষ চিকিৎসকদেরকে নিযুক্ত করা হতো এবং রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা এবং ওষুধ সরবরাহ করা হতো। দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য তিনি দিওয়ান-ই-খয়রাত বা সাহায্য ভান্ডার স্থাপন করেন। এখান থেকে বিশেষ করে মুসলমান বিধবাদের সাহায্য করা হতো ও বিবাহযোগ্যা দরিদ্র মুসলমান মেয়েদের বিয়ের জন্য অর্থ সাহায্য করা হতো।

ফিরোজ শাহ তুঘলক সামরিক বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন। তিনি সামন্ত প্রথার ভিত্তিতে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। সেনাধ্যক্ষদের জায়গীর দেওয়া হয়। যে সব সৈন্যকে জায়গীর দেওয়া হতোনা তাদেরকে কোষাগার থেকে নগদ অর্থে বেতন দেওয়া হতো। সৈন্যরা নিজেদের ঘোড়া জোগাড় করতো এবং এগুলো আরিজ-ই-মমালিকের দফতরে তালিকাভুক্ত করা হতো। সৈন্য বাহিনীর তত্ত্বাবধান ও দুর্নীতি দমন করা ছিল আরিজ-ই-মমালিকের দায়িত্ব। কিন্তু সুলতানের মহানুভবতা ও দয়ার ফলে সৈন্যবাহিনীতে দুর্নীতি প্রবেশ করে এবং সৈন্যবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়ে। সৈন্যবাহিনীতে বৃদ্ধ ও অক্ষম সৈন্যদেরও ভর্তি করা হতো। তাছাড়া দয়াপরবশ হয়ে সুলতান নিয়ম করেন যে কোনো সৈন্য বৃদ্ধ হয়ে গেলে বা অক্ষম হয়ে পড়লে তাঁর স্থলে তার পুত্র, জামাতা বা ক্রীতদাসকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা হবে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা নষ্ট হয়ে যায়।

ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে দিল্লিতে ক্রীতদাসদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে দেশে মোট ১৮০০০ ক্রীতদাস ছিল। আমীরগণ রাজস্বের পরিবর্তে বা অন্য কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উপহার হিসাবে সুলতানকে ক্রীতদাস পাঠাতেন। দাসদের প্রতি লক্ষ রাখার জন্য সুলতান একটি নতুন দপ্তর খুলেছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন যে ক্রীতদাসদের মাধ্যমে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। ক্রীতদাসদের ভরণ-পোষণের জন্য রাজকোষ থেকে প্রচুর অর্থ খরচ করতে হতো, অন্যদিকে রাজস্বের পরিমাণও হ্রাস প্রায়।

ফিরোজ শাহ তুঘলক, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মত অত বড় পন্ডিত না হলেও তিনি জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সমাদর করতেন। তিনি সুফি-দরবেশ ও অন্যান্য পন্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশ-বিদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে ঐ সব মাদ্রাসায় নিয়োগ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দিল্লির ফিরোজিয়া মাদ্রাসা তখনকার একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিল। নগরকোট থেকে নিয়ে আসা ৩০০ সংস্কৃত গ্রন্থ তাঁর আদেশে ফার্সিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। তাঁর সময়ে এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় জিয়াউদ্দিন বারাণীর তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ও শামস-ই-সিরাজ আফিফের তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামের দুটি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অনেক পন্ডিত মনে করেন যে, তিনি ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী ও সিরাত-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থ দুটি রচনা করেছিলেন। শামস-ই-সিরাজ আফিফের মতে সুলতান পন্ডিত ব্যক্তিদের ভাতা হিসাবে বছরে ৩৬ লক্ষ তঙ্কা ব্যয় করতেন।

তুঘলক বংশের পতনে তাঁর দায়িত্ব

রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলক ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তুঘলক বংশের পতনের জন্য তিনি বহুলাংশে দায়ী ছিলেন। প্রথমত, তিনি সাম্রাজ্যের হৃত প্রদেশগুলো উদ্ধার করার কোনো চেষ্টা করেননি। ফলে ক্রমেই সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং দূরবর্তী প্রদেশগুলোতেও কেন্দ্রের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে কমে আসে। দ্বিতীয়ত, জায়গীর প্রথার পুন:প্রবর্তন আমীর ও কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বংশগতভাবে সৈন্য নিয়োগের ফলে একদিকে যেমন সৈন্যবাহিনীর দক্ষতা হ্রাস পায় তেমনি বংশগতভাবে কর্মচারী নিয়োগের ফলে কেন্দ্রীয় শক্তির অবনতির সুযোগে প্রাদেশিক কর্মচারীরা স্বাধীন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, বিশাল ক্রীতদাস বাহিনীর ভরণপোষণ রাজকোষকে ক্রমশ শূন্য করে ফেলে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।প্রজাদের স্বার্থে ও তাদের উন্নতি কল্পেই ফিরোজ শাহ এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জনহিতকর এসব কাজই তাঁর বংশের ও সালতানাতের পতনকে তরান্বিত করেছিল। ড. রমেশচন্দ্র মুজুমদার বলেছেন যে ফিরোজ শাহের দীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও পরিতৃপ্ত অবস্থা বিরাজ করলেও তাঁর নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাবলী যে বহুল পরিমাণে দিল্লি সালতানাতের পতনের সহায়ক হয়েছিল সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। নেপোলিয়ন বোনোপার্ট বলেছিলেন যে, প্রজারা যখন রাজাকে একজন দয়ালু ব্যক্তিরূপে অভিহিত করে তখন বুঝতে হবে যে তাঁর রাজত্বকাল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ফিরোজ শাহ তুঘলক সম্পর্কে নেপোলিয়নের এ উক্তিটি যথাযথভাবে প্রযোজ্য।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা ফিরোজ শাহের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তাঁদের মূল্যায়ণ ফিরোজ শাহের চারিত্রিক গুণাবলী ও তাঁর শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে অতিশয়োক্তি রয়েছে সন্দেহ নেই। বারাণী ও আফিফ সুলতানকে ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, দয়ালু প্রভৃতি গুণের আধাররূপে বারাণীর মতে মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর এরকম বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতো বিনয়ী, দয়ালু, সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও ধার্মিক সুলতান আর দিল্লির সিংহাসনে বসেন নি।তবে ঐতিহাসিকদের অতিশয়োক্তি বাদ দিলেও ফিরোজ শাহ যে একজন প্রজাহিতৈষী. ধর্মভীরু ও দয়ালু সুলতান ছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না।

দীর্ঘ ৩৭ বছর রাজত্ব করার পর ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

সারসংক্ষেপ

দীর্ঘ ৩৭ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে ফিরোজ শাহ তুঘলক সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি দুবার বাংলা আক্রমণ করেও স্বাধীন হয়ে যাওয়া প্রদেশটিকে দিল্লির অধীনে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। অন্যান্য সামরিক অভিযানেও তিনি তেমন সাফল্য অর্জন করেননি। তাঁর রাজত্বকাল বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। জনকল্যাণে তিনি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিহাসে প্রজাহিতৈষী শাসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর সামরিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও অন্যান্য অনেক পদক্ষেপই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তুঘলক বংশের শাসনের পতনে সাহায্য করেছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশেটিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন–
(ক) ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে

২। ফিরোজ শাহ ছিলেন মুহাম্মদ বিন তুঘলকের–
(ক) পুত্র (খ) জামাতা
(গ) পিতৃব্য-পুত্র (ঘ) সেনাপতি

৩। ফিরোজ শাহ বাংলা আক্রমণ করেছিলেন–
(ক) দুবার (খ) তিনবার
(গ) চার বার (ঘ) পাঁচ বার

৪। ফিরোজ শাহের বাংলা আক্রমণকালে বাংলার সুলতান আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন–
(ক) গৌড়ে (খ) পান্ডুয়ায়
(গ) একডালায় (ঘ) সোনারগাঁওয়ে।

৫। ফিরোজ শাহ রাজত্ব করেছিলেন–
(ক) ২৫ বছর (খ) ৩০ বছর
(গ) ৩৫ বছর (ঘ) ৩৭ বছর

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বাংলা অভিযান বর্ণনা করুন।

২। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজ্য বিজয়ের বিবরণ দিন।

২। ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলী আলোচনা করুন। তুঘলক বংশের পতনের জন্য তিনি কতটুকু দায়ী ছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। আবদুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন।*

২। Aga Mehdi Husain, *The Tughlaq Dynasty.*

৩। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*

৪। R.C.Majumdar (ed.), *History and Culture of the Indian People,* Vol. VI, *The Delhi Sultunate.*

পাঠ - ৬

সুলতানি আমলে উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- উপমহাদেশের সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বয়ী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন ;
- প্রশাসনিক অবকাঠামো এবং শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ;
- সুলতানি আমলে উপমহাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাবেন ;
- আর্থ-বাণিজ্যিক অবস্থা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বয়ী বৈশিষ্ট্য

উপমহাদেশে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। কঠোর একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠা, বিধর্মী পৌত্তলিকদের প্রতি অনতিক্রম্য ব্যবধান বোধ ও বিতৃষ্ণা, ইসলামের গন্ডির অন্তর্ভুক্ত সকলের সম্পর্কে ভ্রাতৃভাব, সামাজিক রীতিনীতিতে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের সংহত এবং স্বতন্ত্র করে রেখেছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে পুষ্ট করে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যবোধ সত্ত্বেও মুসলমান যুগে হিন্দু ও মুসলমান মিলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে নতুন রূপান্তর সংগঠন করেছিল। সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান ভারতবর্ষের সমন্বয় ধারা সুলতানি আমলে খন্ডিত হয়নি। মুসলমান শাসনাধীনে নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্যেও সমাজ-সংস্কৃতির নব নব উন্মেষ অব্যাহত থাকে। অবশ্য শক, হুন, গ্রিক প্রভৃতি বিদেশী জাতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে এসে যেভাবে তাদের স্বকীয় সত্তা হারিয়ে 'ভারতীয়' হয়ে গিয়েছিল মুসলমানরা ঠিক সেই মাত্রায় স্বকীয়তা বিসর্জন দেয়নি। প্রথমদিকে স্বতন্ত্র অস্বিত্ব সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে 'গোঁড়ামী' দেখা গেলেও ক্রমে ক্রমে তা নমনীয় হয়ে আসে। তাই শাসনের প্রথমদিকে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিদ্বেষ, আক্রোশ, আতঙ্ক, ধর্মাবেগ ইত্যাদির আতিশয্য থাকলেও ক্রমেই এক ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। তদুপরি আর্থ-সামাজিক জীবনে পরস্পরের সহযোগিতা ব্যতিত অস্তিত্ব সংরক্ষণ করাই দুরূহ হতো। তাই হিন্দু জমিদার ও কৃষকদেরকে অত্যাচারের মাধ্যমে বা জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার অভিযোগ সত্য নয়। এ অভিযোগ সত্য হলে গঙ্গা-যমুনার যে দোয়াব অঞ্চল একটানা সাতশো বছর মুসলিম শাসনে থেকেছে, সেখানে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখা যেতো না। প্রকৃতপক্ষে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মূলগত পরিবর্তন খুব একটা হয়নি; পল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা মোটামুটি পূর্বেকার মতো জীবনযাত্রা চালিয়ে গেছে। পরিবর্তন ঘটেছিল ভাসা ভাসা ভাবে, সমাজের ওপর তলায়, শহর অঞ্চলে, এবং প্রধানত সম্পত্তি বিন্যাসে।

প্রথমদিকে হিন্দু ও মুসলমান নৈকট্যকে উভয় পক্ষের পরস্পর প্রীতির লক্ষণ মনে করলে ভুল হতে পারে। অনেক সময়ে নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এরূপ নীতি অনুসৃত হয়ে থাকতে পারে। অবশ্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবং কতোকটা অজ্ঞাতসারে এই সহযোগিতার সূত্রপাত হলেও উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুফল দেখা দিয়েছিল। শিল্পে, কারুকর্মে, সঙ্গীতে, চিত্রাংকনে, সৌধ নির্মাণে, খানাপিনাতে এই সংমিশ্রণ লক্ষ না করে উপায় নেই। এই জন্যই পন্ডিত মার্শাল বলেন, 'দুইটি একান্তভাবে পৃথক অথচ বিপুল ও সুগঠিত সভ্যতার এরূপ সংমিশ্রণের উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।' হিন্দু আর মুসলিম সংস্কৃতি একে অন্যকে গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু পরস্পর প্রভাবিত হয়ে উভয়ের চরিত্রে নবরূপ দেখা দিয়েছিল।হিন্দুদের অনেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান হলে মুসলিম সমাজে হিন্দু রীতিনীতি প্রবেশের

সুযোগ তৈরি হয়। হিন্দু সাধু-সন্তের মতো মুসলমানদের পীর-পয়গম্বর, সুফি সম্মান পেতে লাগলেন। ইসলামে জাতিভেদের কোনো স্থান নেই, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে বহুকাল যাবত জাতিভেদ বিদ্যমান থাকায় মুসলমানদের মধ্যেও শ্রেণীগত বৈষম্য দেখা যায়। এছাড়া মুসলমানদের প্রখর প্রভাব থেকে হিন্দু সমাজকে বাঁচাতে হিন্দুরা অনেক উদারতার আশ্রয় নিতে শুরু করে। সামাজিক রীতিনীতি থেকে হিন্দুদের 'গোঁড়ামি' কমে যায়। রামানন্দ, কবীর, শ্রী চৈতন্য, নানক প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা হিন্দু সমাজ রক্ষায় সমন্বয় ধারার পক্ষাবলম্বন করেন এবং অনুদার হিন্দু সমাজকে উদারতার মন্ত্রে দীক্ষা দেন।

হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবে এবং দুই শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনে ফলস্বরূপ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের, বিশেষত লোক সাহিত্যের, প্রসার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। হিন্দি, মারাঠি, পাঞ্জাবি, বাংলা ইত্যাদি শক্তিশালী ভাষার বিকাশ ঘটে এ যুগেই। সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে যে নতুন শিল্পরীতি গড়ে ওঠে, তার চমৎকারিত্ব এ উপমহাদেশের গর্বের বস্তু। সৌন্দর্য সৃষ্টির দিক থেকেও এর মূল্যপ্রভূত।

সুলতানি শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

দিল্লির সুলতানদের শাসনব্যবস্থা ও নীতি সুস্পষ্ট আইনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তবে এই শাসনে Theocracy বা পুরোহিততন্ত্র ছিল না। দিল্লির শাসন ব্যবস্থায় পুরোহিতদের কোন স্থান ছিল না। ভারতবর্ষের মুসলমান সুলতানরা পুরোহিততন্ত্র কায়েম করেননি। দিল্লির সুলতানরা ব্যবহারিক লোক ছিলেন। আমীর ও সৈন্যদের ওপর তাঁদের ক্ষমতা ও সালতানাতের স্থায়িত্ব নির্ভর করতো। তাই তাঁদের সন্তুষ্টি বিধান এবং তাঁদের কাছে নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য কোন কোন সুলতান আব্বাসীয় খলিফাদের স্বীকৃতি লাভ করেন। এটি তাঁরা রাজনৈতিক কারণেই করেছেন এবং এর বাইরে আব্বাসীয় খলিফাদের সাথে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না। দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে দিল্লির সুলতানরা ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হন। সুলতান ইলতুৎমিশ এই ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রবর্তন করেন। সুলতান বলবন প্রায় চল্লিশ বছর দিল্লির শাসনকার্য পরিচালনা করেন।যদিও তিনি আলেমদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতেন। কিন্তু শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি সালতানাতের উন্নতির দিকে লক্ষ রেখে নীতি নির্ধারণ করতেন। ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজীও অনুরূপ নীতি অনুসরন করতেন। তিনি মনে করতেন যে, রাজ্য শাসন এবং ইসলামের অনুশাসন দুটি ভিন্ন জিনিস। রাজ্য শাসনের জন্য সুলতান দায়ী এবং ইসলামি ব্যাখ্যা দেওয়া কাজি ও মুফ্তিদের দায়িত্ব। শাসন ব্যাপারে তিনি কখনো আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন না। সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক আলেমদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু সে সময়ে দিল্লির ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা স্থায়ী রূপ নিয়েছে এবং তা পরিবর্তন করা আলেমদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আলেমরা দিল্লি সালতানাতের রাজনৈতিক সমস্যাদির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং এই কারণে সুলতানের নীতি সমর্থন করেন। সুলতান রাজিয়ার সিংহাসন আরোহণই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোন স্ত্রীলোক সিংহাসনে আরোহণ করায় আলেম ও রক্ষণশীলদের ঘোরতর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সুলতান রাজিয়া সিংহাসনে আরোহণ করলে তাঁরা বিশেষ আপত্তি করেননি। আলেমরা শুধু আশা করতেন যে, সুলতানরা ইসলামি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন হবেন, শরীয়তের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে কিছু করবেন না এবং শরীয়ত শিক্ষার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

দিল্লি সালতানাতের সুলতান নিজে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।তাঁরা ঐশ্বরিক রাজাধিকারে (Divine Right of Kingship) বিশ্বাস করতেন। সুলতান ইলতুৎমিশের সময় আলেমরা এ ব্যাপারে আপত্তি করলে সুলতান বিশেষ বাড়াবাড়ি না করে মধ্যপন্থা অনুসরণ করেন। সুলতান বলবনই প্রথম আমীরদের ক্ষমতা খর্ব করে স্বীয় ইচ্ছানুসারে রাজ্য শাসন করেন এবং তাঁর অনুসৃত নীতি পরবর্তী সুলতানরাও পালন করেন। কিন্তু বরাবর সুলতানের ক্ষমতা কতগুলো কারণে সীমিত থাকতো। প্রথমত: দিল্লির সুলতানরা আইন তৈরি করতে পারতেন না। তাঁরা শরীয়ত আইন দ্বারা চালিত হতেন। এমনকি আলাউদ্দিন খলজীর মতো স্বৈরাচারী সুলতানও বিচার বিভাগ কাজিদের হাতে ছেড়ে দিতেন। দ্বিতীয়ত: সুলতানরা আমীরদের

ক্ষমতার প্রতিও নজর রাখতেন। যেহেতু সৈন্যবাহিনী এবংআমীরদের সহযোগিতার ওপর সুলতানদের ক্ষমতা নির্ভরশীল ছিল, সেহেতু সুলতানরা সব গুরুতর বিষয়াদি আমীরদের সাথে আলোচনা করতেন এবং তাদের সহযোগিতায় কর্মপদ্ধতি ঠিক করতেন; এমনকি সুলতান নির্ধারণের ব্যাপারেও আমীরদের হাত ছিল।

সুলতানি আমলের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থার চরিত্র আক্ষরিক অর্থেই ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। সুলতানগণ এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন যা ছিল পারস্যরীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ পারসিক রাজাদের রাজক্ষমতার তত্ত্ব থেকে তাঁরা তাঁদের রাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর, সংগঠন, হারেম, খোজা প্রহরী, ক্রীতদাস, দাসী, অনুচর, পরিচালক, জাকজমকপূর্ণ উৎসবাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রাজকীয় প্রতীক চিহ্ন - সবই তাঁরা পারসিক রাজতন্ত্র থেকে গ্রহণ করেন। স্বভাবতই, পারসিক এই ধারার অনুসরণেই ভারতবর্ষে এক নতুন রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। যার সঙ্গে কোরআনে বর্ণিত শরিয়তী শাসনব্যবস্থার কোন মিল পাওয়া যায় না।

সুলতানি আমলে রাজপদে নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইন বা রীতি সুনির্দিষ্ট ছিল না। সুলতান সিংহাসনে বসতেন তাঁর শক্তির জোরে। সালতানাতের স্থায়িত্বও নির্ভর করতো সুলতানের সার্বিক দক্ষতার ওপর। অন্যান্য প্রশাসনিক সংস্থাগুলো সুলতান পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যেতো অথবা নতুন সুলতানের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে টিকে থাকতো। কোন কোন সুলতান তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করে যেতেন। তবে সেই ব্যক্তির সিংহাসনে বসা কিংবা টিকে থাকা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো তাঁর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও প্রতিভার ওপর।এ কাজে অভিজাতদের একটা ভূমিকা ছিল।তাঁরা ইচ্ছা করলে নিজেদের মনোনীত যে কোন ব্যক্তিকে, এমন কি প্রাক্তণ সুলতানের বংশের বাইরের লোককেও, সিংহাসনে মনোনীত করতে পারতেন।

সুলতান স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী হলেও তা অনিয়ন্ত্রিত বা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। এর মূলে ছিল বাস্তব প্রয়োজনবোধ। মধ্যযুগে সুলতানের স্বৈরতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোন সংগঠিত রাজনৈতিক সংস্থা ছিল না। অভিজাতরা ছিলেন স্বার্থান্বেষী এবং গোষ্ঠী–রাজনীতির শিকার, উলেমারাও পদের মোহে ক্ষমতাবান সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। সর্বোপরি তখন কোন জনপ্রতিনিধিমূলক পরিষদ বা সাংবিধানিক রীতি ছিল না, যা জনগণের ইচ্ছার সাথে প্রশাসকের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম। স্বভাবতই সুলতান ছিলেন অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বিচক্ষণ সুলতানরা এই অর্জিত ক্ষমতার অপব্যবহার খুব কমই করতেন। বিচক্ষণ সুলতানগণ উপলব্ধি করেন যে, সুবিস্তৃত রাজ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তাঁরা একটা শাসন পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। এখানে নিয়োজিত হন বিভিন্ন স্তরের কর্মীমন্ডলী।এরা ব্যক্তিগতভাবে বা সংঘবদ্ধভাবে সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। তবে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা ছিল সম্পূর্ণভাবে সুলতানের ইচ্ছাধীন। তথাপি একথা সত্য যে, সুলতানের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাদের একটা ভূমিকা ছিল।

সুলতানি যুগে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন নানা বিভাগের হাতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সুলতানি শাসনব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন 'উজির'। তিনি মূলত রাজস্ব-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হলেও বর্ণিত বিভাগগুলোর ওপর কর্তৃত্ব করতেন– দিওয়ান-ই-রিসালৎ (আপীল বিভাগ); দিওয়ান-ই-ইনসা (ডাক বিভাগ); দিওয়ান-ই-আরজ (সামরিক বিভাগ); দিওয়ান-ই- বান্দা (দাস বিভাগ); দিওয়ান-ই-আমীর কোহি (কৃষি বিভাগ: মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সৃষ্ট); দিওয়ান-ই-খয়রাত (দাতব্য বিভাগ: ফিরোজ শাহ তুঘলকের সৃষ্ট) দিওয়ান-ই-ইসতিফার্ক (পেনসন বিভাগ) ইত্যাদি। এছাড়া সর্বোচ্চ হিসাব-রক্ষক মুস্তাফী-ই মামলিক". সরকারি ঋণ সম্পর্কিত হিসাবরক্ষক 'মজুমদার', কোষাধ্যক্ষ, 'খাজিন', নৌবহরের অধ্যক্ষ 'আমীর-ই-বহর', সৈন্যবিভাগের বেতন-প্রদানকারী 'বক্সী-ই-ফৌজ' প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনা করতেন। এই বিভাগগুলো উজিরের অধীনস্ত বিভাগ বলে বিবেচিত হতো।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সুলতানের পরেই ছিল উজির (প্রধানমন্ত্রী স্বরূপ)-এর স্থান। সাধারণভাবে উজিরের ক্ষমতা নির্দিষ্ট ছিল না। তা নির্ভর করতো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং সুলতানের সাথে তাঁর সম্পর্কের ওপর। যেমন মুহাম্মদ বিন তুঘলকের উজির খাজা জাহান সুলতানের অবর্তমানে রাজধানীতে সুলতানের কাজ পরিচালনার

অধিকারী ছিলেন। ফিরোজ তুঘলকের উজির সুলতানের অতি বিশ্বস্ত এবং কর্মদক্ষ ছিলেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। এই সময়কে উজিরৎ-এর চরম গৌরবের কাল বলা হয়।

প্রথম দিকে সাধারণত সামরিক কাজে দক্ষ ব্যক্তিরাই উজির পদে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে রাজস্ব কাজে দক্ষদের এই পদে নিয়োগ দান করা হতো। উজিরের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনা করা। তবে সাধারণভাবে তিনি ছিলেন সমগ্র অসামরিক প্রশাসনের তত্ত্বাবধায়ক। সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে উজিরকে সাহায্য করার জন্য একজন হিসাব রক্ষক ও একজন হিসাব পরীক্ষক থাকতেন। সালতানাতের স্বার্থে উজির পদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অব্যাহত থাকা আবশ্যিক ছিল। কারণ, সুলতানের খেয়ালী মনের নিয়ন্ত্রণ এবং শাসক ও শাসিতের যোগসূত্র হিসাবে উজির প্রশাসনকে স্থায়িত্বদানের দায়প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু সুলতানরা প্রায়শই সন্দেহবশত: উজিরের ক্ষমতা খর্ব করে নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতেন।

'উজির'-এর বিভাগের পরই রাজনীতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'দিওয়ান-ই-আরজ'। এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন 'আরিজ-ই- মমালিক'। তাঁর প্রধান কাজ ছিল সৈন্য নিয়োগ ও তাদের বিবরণীসহ ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করা। আরিজ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন না। সুলতানই ছিলেন সর্বাধিনায়ক। কারণ এ যুগে কোন সুলতানই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব অন্য কোন ব্যক্তির হাতে অর্পন করতে চাইতেন না।

রাজকীয় সমস্ত যোগাযোগের পত্রাদি রচনা এবং যথাস্থানে প্রেরণ করার দায়িত্ব দিওয়ান-ই-ইনসা বা ডাক বিভাগের ওপর ন্যস্ত ছিল। এই বিভাগের প্রধানকে সুলতানের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হতে হতো। কারণ, বহু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি গোপনীয় পত্রাদি রচনার দায়িত্বও ছিল এই বিভাগের। এমনকি সুলতানের গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয় ইস্তেহার এই বিভাগই রচনা করে সুলতানের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতো এবং অনুমোদনের পর তার অনুলিপির রেকর্ড রেখে যথাস্থানে প্রেরণ করতো।

দিওয়ান-ই-রিসালৎ বা আপীল বিভাগ ধর্ম ও নীতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ এবং জনকল্যাণমূলক কাজের দায়িত্ব পালন করতো। সাধারণত প্রধান 'কাজি-উল-কুজ্জাৎ' এই পদ অলঙ্কৃত করতেন। প্রধান কাজি আবার বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। মুসলিম 'শরিয়ত' অনুযায়ী দেওয়ানি মামলার বিচার করতেন। হিন্দু-আইন অনুসারে হিন্দুদের বিচার হতো। ফৌজদারী দন্ডবিধি অত্যন্ত কঠোর ছিল।

উপর্যুক্ত বিভাগগুলো ছাড়াও সুলতানি সাম্রাজ্যের সমস্ত সংবাদ জানার জন্য সুলতান 'বারিদ' নামে এক ধরনের গুপ্তচর নিয়োগ করতেন। সুলতানের সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন অভিজাতরাই বারিদের পদে নিযুক্ত হতেন।

ফিরোজ শাহ তুঘলক এক পৃথক পূর্ত-বিভাগ স্থাপন করেন। খাল খনন, কূপ খনন, ও বহু জনহিতকর অট্টালিকা নির্মাণের দায়িত্ব এই বিভাগ পালন করতো। তাছাড়া কোতোয়াল বা পুলিশের দপ্তর আইন-শৃংক্মখলা রক্ষা, চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার কাজ করতো। প্রতি শহরে কেতোয়াল ছিল। গ্রামে গ্রামসভা ও গ্রামরক্ষী শান্তি রক্ষা করতো।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

সুলতানি আমলে রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চল সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকতো। দূরবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রের অনুরূপ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতার পরিধি নির্দিষ্ট ছিল না। এই পদের স্থায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের চরিত্র নির্ভর করতো সুলতানের সাথে তাদের সম্পর্কের ওপর। তাছাড়া দূর্বল সুলতানদের আমলে প্রাদেশিক শাসকদের যতোটা স্বাধীনতা বা কর্তৃত্ব থাকতো, ক্ষমতাবান সুলতানদের আমলে স্বভাবতই তা কিছুটা কমে যেতো। তবে করদ-রাজ্যগুলো অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো।সাধারণভাবে সুলতানি সাম্রাজ্যের স্বার্থ-বিরোধী কাজে লিপ্ত না হলে, মুসলমান অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা ক্ষুন্ন না করলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সমর্থ হলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের কাজে বাধা সৃষ্টি না করলে রাজ্যের প্রশাসনিক স্বাধীনতায় সুলতান সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের তীক্ষ্ণ নজরদারী সব সময় বলবৎ থাকতো। প্রদেশগুলোকে 'ইক্তা' নামক সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে একজন করে সামরিক শাসকের

অধীনে রাখা হতো। ইক্তার শাসকেরা মাক্তি, ওয়ালি, নায়েব সুলতান বা ইক্তাদার নামে অভিহিত হতেন।

আলাউদ্দিন খলজীর আমল থেকে প্রাদেশিক শাসনে কিছু পরিবর্তন ঘটে। আলাউদ্দিন বহু নতুন স্থান জয় করেন। তাঁকে নতুন করে প্রাদেশিক শাসন পদ্ধতি ঠিক করার কথা ভাবতে হয়। তিনি কয়েক প্রকার প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তন করেন, যথা: (১) পুরাতন ইক্তা বা প্রদেশগুলো যেমন ছিল তেমন থাকে। এখানে স্থিতাবস্থা রক্ষা করা হয়। (২) নতুন বিজিত বৃহৎ প্রদেশগুলো শাসনের জন্য 'ওয়ালি' নামক শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। এভাবে আলাউদ্দিনের আমল থেকে প্রাদেশিক শাসনে নতুন পর্যায় আরম্ভ হয়। ওয়ালিদের মর্যাদা নি:সন্দেহে মাক্তিদের অপেক্ষা বেশি ছিল। ওয়ালিদেরও সুলতানকে নিয়মিত রাজস্ব, দরকার মতো সেনা সাহায্য এবং আনুগত্য দিতে হতো।

সুলতানকে তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিলে তিনি সাধারণত প্রাদেশিক শাসনে হস্তক্ষেপ করতেন না। ওয়ালিরাও মাক্তির মতোই আইন-শৃংক্মখলা রক্ষা, ইসলামের আইনগুলো প্রয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতির জন্য কাজ করতেন। প্রদেশের যাবতীয় ব্যয়ভার মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রে পাঠাতেন। যে কোন রকম কারচুপি রোধের জন্য 'খাজা' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী হিসাব পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হতো।

সুলতান মুহাম্মদ-বিন-তুঘলকের আমলে সুলতানি সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং আঞ্চলিক প্রশাসনে উন্নতির ফলে প্রদেশগুলোকে আরো ছোট এককে ভাগ করা হয়। এগুলোকে বলা হতো 'শিক'। শিকের শাসনকর্তাকে শিকদার বলা হতো। মুহাম্মদ বিন তুঘলক দাক্ষিণাত্যকে চারটি 'শিক'-এ বিভক্ত করেছিলেন। দোয়াবকে ভেঙ্গে দুটি 'শিক' গঠন করা হয়েছিল। সম্ভবত 'শিকদার'ও একজন সামরিক ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ নিজ অঞ্চলের আইন-শৃংক্মখলা রক্ষার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। শিকগুলোর মধ্যে আরো ছোট শাসনতান্ত্রিক বিভাগ ছিল 'পরগণা'। প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে 'পরগণা'র বিশেষ গুরুত্ব এই যে এখানেই সরকারি কর্মচারীরা কৃষকদের সাথে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতেন। পরগণার কর্মচারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'আমিল'। পরগণার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীর মধ্যে ছিলেন মুশারিক, হিসাব রক্ষক, দুজন কারকুন, কানুনগো প্রমুখ। পরগণায় 'চৌধুরী' নামে একটি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সম্ভবত: উৎপাদক ও সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতা করতেন।

শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক ছিল 'গ্রাম'। গ্রামের মুখ্য আধিকারিক ছিলেন 'গ্রাম প্রধান'। তাঁকে সাহায্য করতেন পাটোয়ারী বা হিসাব রক্ষক। পাটোয়ারী চাষযোগ্য এলাকা ও মোট উৎপাদনের হিসাব রক্ষা এবং রাজস্ব নির্ধারণ এবং সরকারের প্রাপ্য প্রদানের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন।

সুলতানি যুগের রাজস্বব্যবস্থা

সুলতানি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল যুদ্ধের মাধ্যমে এবং তার স্থায়িত্বও নির্ভরশীল ছিল সামরিক শক্তির ভূমিকার ওপর। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সুলতান ও অভিজাতদের ব্যক্তিগত উচ্চাশা। সুলতানগণ সবক্ষেত্রে পারসিক আদব-কায়দা অনুকরণে আগ্রহী ছিলেন। তার জন্য প্রয়োজন ছিল সুদৃশ্য ও সুবিশাল রাজপ্রসাদ, জাঁকজমকপূর্ণ দরবার। তাই প্রশাসক শ্রেণীর এই আবশ্যক ও অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য মেটানোর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। সেকালে শিক্ষাজাত আয়ের সুযোগ ছিল প্রায় শূন্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা গতিশীলতা এলেও বাণিজ্যসূত্রে কোষাগারের আয় ছিল নগণ্য। ভারত কৃষি প্রধান দেশ। তাই কৃষিই ভারতের রাজস্বের প্রধান উৎস। ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে দিল্লির সুলতানগণ ভারতের চিরাচরিত রাজস্বব্যবস্থা বর্জন করে আধুনিক রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন।

সুলতানি যুগের রাজস্বব্যবস্থা বিশে- ষণ করলে দেখা যায়, রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল পাঁচ প্রকার যথা– ১. খারাজ, ২ খামস্, ৩. যাকাত, ৪. উরস ৫. জিজিয়া। এছাড়া আরও অন্যান্য কর, গোচারণ কর, জলকর ও গৃহকর আদায় করা হতো। "আবওয়াব" নামে আর এক ধরনের অতিরিক্ত করের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক স্থাপনের দ্বারাও সরকারি আয় হতো।

কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও দেয় রাজস্বের হার সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে তেমন আলোকপাত করেননি। তবে সেকালে আগত বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে এ সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবত: তুর্কি শাসকরা উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ ভূমিরাজস্ব হিসেবে আদায় করতেন। ব্যতিক্রম হিসেবে আলাউদ্দিন খলজী ৫০ শতাংশ

রাজস্ব ধার্য করেছিলেন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াব প্রভৃতি উর্বর অঞ্চলে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসেবে আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য মুহাম্মদ বিন তুঘলক দোয়াবে শস্যহানী ও বিদ্রোহের কারণে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করেননি। রাজস্বের হার নির্ধারণের কোন নির্দিষ্ট বিধি ছিল না। তবে কোরআনের অনুশাসন অনুসারে এই হার নির্ধারণের একটা প্রবণতা ছিল। গিয়াসউদ্দিন তুঘলক নীতিগতভাবে কোন একটি বছরে সর্বোচ্চ এগারো বা দশ শতাংশের বেশি রাজস্ব বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক কৃষিকাজের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে 'দিওয়ান-ই-কোহী' নামে একটি কৃষি দপ্তর গঠন করেন। ফিরোজ শাহ তুঘলক কৃষকদের কৃষি ঋণ 'তাকাভি' পরিশোধ থেকে রেহাই দেন। তিনি আরো প্রায় চব্বিশটি সাধারণ কর মওকুফ করে চাষীদের বোঝা লাঘব করেন। খারাজ বা ভূমি রাজস্ব ছিল রাজকোষের আয়ের প্রধানতম উৎস। প্রথমে এটি কেবল হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হতো। এর কারণ সুলতানি শাসনের সূচনা পর্বে মূলত: হিন্দুরাই চাষ-আবাদের সাথে যুক্ত ছিল। পরে মুসলমানরাও কৃষিকাজের সাথে যুক্ত হলে এই করের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আগের মতো এ যুগেও জমির প্রকৃত মালিকানা ছিল সুলতানের হাতে। জমির বিলি-বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব নির্ধারণ ইত্যাদি সবই ছিল সুলতানের ইচ্ছাধীন। তখন জমির চারটি শ্রেণী বিন্যাস লক্ষ করা যায়। এগুলো হলো খালিসা জমি, ইক্তা, হিন্দু প্রধানদের অধীনস্থ জমি এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তি। খালিসা জমি সুলতান ইচ্ছামতো বন্দোবস্ত দিতেন। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মতো এ ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে এই জমির রাজস্ব আদায় করতেন। পরগণায় 'আমিল' এবং গ্রামে পাটোয়ারী, চৌধুরী, মুকদ্দম নামক কর্মচারী এই রাজস্ব আদায় করতেন। 'ইক্তা' ছিল এক ধরনের সামরিক– প্রশাসনিক বিভাগ। এই বিভাগের অধিকর্তা অর্থাৎ ইক্তাদার সুলতান কর্তৃক নির্দিষ্ট ভুখন্ডের রাজস্ব আদায় করতেন এবং ইক্তার প্রশাসনিক খরচ বাদে উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় কোষাগারে জমা দিতেন। খাজা নামক কেন্দ্রীয় কর্মচারী ইক্তাদারের রাজস্ব বিষয়ক কাজ পরিদর্শন করতেন। তৃতীয় শ্রেণীর সম্পত্তি ছিল হিন্দু জমিদারদের হাতে, যারা আগে থেকেই এ সকল জমি চাষ-আবাদের অধিকার ভোগ করছিলেন। এরা সুলতানকে বার্ষিক নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শর্তে পূর্ব অধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওয়াক্ফ বা ইনাম ছিল নিষ্কর সম্পত্তি। সুলতান মুসলিম বিজ্ঞানী, পন্ডিত ও সন্তাদের সেবায় এই জমি দান করতেন। তবে আলাউদ্দিন খলজী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে রাজস্বের বিনিময়ে বন্দোবস্ত দেন। তিনি খুৎ, মুকদ্দম, চৌধুরী প্রমুখ গ্রামীণ রাজস্ব আদায়কারী কর্মগোষ্ঠীর ওপরেও কর আরোপ করেন। ইতোপূর্বে এই মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী কৃষকদের শোষণ করে বহু রাজস্ব আত্মসাৎ করতেন, কোন রকম কর দিতেন না।

খাম্স বা যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ রাজকোষে জমা হতো। যদি এই করকে সুলতানি যুগের প্রধান উৎস বলা হয়েছে, কিন্তু এটা অনিয়মিত ছিল।

যাকাত : শুধু মুসলমানদের থেকে আদায় করা হতো। এটি ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত কর। ইসলামশাস্ত্র অনুযায়ী এই কর প্রতিটি মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা যায় না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এক বছর পার না হলে, কারও সঞ্চিত ধনের ওপর যাকাত ধার্য করা যায় না। অর্থাৎ এক বছরের প্রয়োজনীয় ব্যয়বাদে কারও কাছে যদি সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে, তাহলে সে ব্যক্তিকে শাস্ত্রসম্মত ধনী বলে। এই ধরনের ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা শতকরা ২.৫০ হারে যাকাত গ্রহণ করতে হবে। এই নিয়ম অনুযায়ী সকল মুসলমানদের কাছ থেকে এই কর সুলতানি যুগে আদায় করা হতো না। যারা শাস্ত্রসম্মত ধনী, তাদের কাছ থেকেই এই কর আদায় করা হতো।

উরস্ বা ভূমি করও মুসলমানদের থেকে আদায় করা হতো। এই করটিও সকলের ওপর প্রযুক্ত ছিল না। এই কর উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ভূমিকর হিসেবে আদায় করা হতো।

জিজিয়া : অ-মুসলমানদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করা হতো। এটাও ছিল এক প্রকার ধর্ম-কর। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অ-মুসলমানদের জীবন, সম্পত্তি ও ধর্মস্থানের নিরাপত্তার জন্য এই কর দিতে হতো। এরও কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল না। ধনী ব্যক্তিরা ৪৮ দিরহাম, মধ্যবিত্তরা ২৪ দিরহাম এবং অন্যান্যরা ১২ দিরহাম জিজিয়া হিসেবে প্রদান করতেন। অবশ্য অনেকেই জিজিয়া প্রদান থেকে রেহাই পেতেন। মহিলা, শিশু, ভিক্ষুক বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ এবং যাদের কোন আয় নেই এমন লোকদের জিজিয়া দিতে হতো না। অবশ্য ফিরোজ শাহ তুঘলক ব্রাহ্মণদের ওপরেও জিজিয়া আরোপ করেছিলেন। যাই হোক, জিজিয়া থেকে খুব কম রাজস্বই আদায় হতো। অধ্যাপক রোমিলা থাপার মনে করেন, শহুরে উচ্চ-আয়

সম্পন্ন মানুষের ওপরেই জিজিয়া আরোপিত হতো। গ্রামাঞ্চলের কৃষকদের ওপর এই করভার বহন করার ক্ষেত্রে সম্ভবত কড়াকড়ি ছিল না।

উপর্যুক্ত করসমূহ ছাড়াও সুলতানি আমলে বিভিন্ন সময়ে নানা রকমের কর আদায় করা হতো। এভাবে আলাউদ্দিন খলজী গৃহকর এবং পশুচারণক্ষেত্র কর আদায় করতেন। উত্তরাধিকারীবিহীন কোন মুসলমানের মৃত্যুর পর তার সম্পত্তিও রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে অধিকৃত হতো। বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসক এবং অনুগত সামন্তদের থেকে উপঢৌকন হিসেবেও কেন্দ্রীয় কোষাগারে কিছু অর্থ-সম্পদ জমা পড়তো।

সুলতানি যুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারতবর্ষ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। তাই সুলতানি যুগের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ ছিল কৃষি। কৃষিই ছিল রাজস্বের প্রধান অবলম্বন। সে সময়ে লোকসংখ্যার অনুপাতে ভূমি ছিল প্রতুল। গাঙ্গেয় উপত্যকার বহু অংশ তখনও ছিল অকর্ষিত, জঙ্গলময়। অধিকন্তু জমি ছিল ভীষণ উর্বর। অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রচুর ফসল ফলতো এবং বছরে দুবার ফলতো। ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায় যে শরৎকালীন ফসলকে 'খরিফ' এবং বসন্তকালীন ফসলকে 'রবি' বলা হতো। অন্য একটি বিবরণী থেকে জানা যায় যে, প্রায় ২৫ রকমের ফসলের উৎপাদন চাষীরা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অঞ্চলের জমিতে করতো। প্রধান কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে গম, ধান, পাট, কলাই, ভুট্টা, আলু, বাদাম, তামাক, আখ, তৈলবীজ, যব, মশলা, নারকেল, পান, সুপারি, আদা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আফিম, নীল প্রভৃতির চাষও হতো।

সুলতানি যুগের প্রাথমিক পর্বে আক্রমণকারীর রণলি≈ার আগুন প্রশমিত হলে, কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা শুরু হয়। আলাউদ্দিন খলজীর জমি– জরিপ, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের 'আমীর কোহি' নামে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগের সৃষ্টি, ফিরোজ তুঘলকের সেচ-পরিকল্পনা প্রভৃতি কৃষি উন্নতির দৃষ্টান্ত। এমনকি, এ যুগেই দুর্ভিক্ষকালে সরকারি খরচে চাষীদের অর্থ, শস্যবীজ, বলদ, চাষাবাদের জমি প্রভৃতি সাহায্যদান এবং যৌথ খামার ব্যবস্থা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুলতানি যুগে কৃষকই ছিল ভারতের জনসাধারণের সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক জীবন কেমন ছিল সে সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বিদেশী যেসব পর্যটক ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের বিবরণে কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।ভারতীয় কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে বিদেশী ও সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আশ্চর্য রকম নীরব। তবে আমীর খসরু সাধারণভাবে ভারতীয় কৃষকদের দক্ষতা ও সারল্যের প্রশংসা করেছেন মাত্র। এছাড়া তিনি আর বিশেষ কিছু বলেন নি। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন সুলতানি যুগে কৃষকদের কাছ থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো। তারা আলাউদ্দিন খলজী ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক আদায় করতেন, এ কথাও বলেছেন। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, কৃষকদের অবস্থা পূর্বের মতোই ছিল, এ সময়ে খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তাদের অবস্থা যে খুব স্বচ্ছল ছিল তা বলা যায় না। জীবিকার জন্য কৃষকদের আজকের মতোই মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতো। কৃষকদের আজকের মতোই দুর্দশার সীমা ছিল না। তবে বাংলায় জিনিসপত্রের দাম যে অত্যন্ত সস্তা ছিল, তা ইবনে বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়। সাধারণ কৃষকদের এই সামান্য পয়সা উপার্জন করাও কষ্টকর ছিল। সুলতান ও অভিজাতদের যেমন ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না; তেমনি আবার দরিদ্র কৃষকদের ন্যূনতম অন্নবস্ত্রেরও আশ্বাস ছিল না। মূলতঃ দেশের প্রশাসকরা কৃষকের শ্রমের ফলে ভাগ বসাতো এবং বিনিময়ে কৃষকরা যাতে শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে তাদের পেশায় মনোনিবেশ করতে পারে, তার ব্যবস্থা প্রশাসন করেছিল। এটুকুই ছিল কৃষকদের শান্তি।

শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের অর্থনীতি ছিল একান্তভাবেই কৃষি নির্ভর। তবে এ সময়ে শিল্প বা কারিগরী কর্মেও ভারতবাসী দক্ষতা অর্জন করেছিল। অবশ্য অর্থনীতির রূপান্তর সাধনে শিল্পের ভূমিকা ছিল নগণ্য। সেক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল অনেক বেশি উন্নত ও প্রসারিত। তবে এই আমলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ বা পরিকল্পিত প্রচেষ্টার অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। সবটাই এসেছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং স্থানীয় প্রয়োজনবোধ থেকে।

সুলতানি আমলে ক্ষেতের ফসলকে কেন্দ্র করে গ্রামে নানা ধরনের কুটির শিল্প গড়ে ওঠে; যথা-চিনি, সেন্ট, তেল, সুরা, দড়ি ও ঝুড়ি বানানো ইত্যাদি। ক্ষেতের ফসল নানরকম হস্তশিল্পকে উপজীবিকা করে বাঁচার পথও খুলে দেয়। তাঁতী, চর্ম-শিল্প, রঞ্জক, কাঠের কারিগর ও সুতিবস্ত্র-রঞ্জকের কাজের অভাব ছিল না।

গ্রামীণ শিল্প ছাড়াও মধ্যযুগে এমন কিছু শিল্প গড়ে উঠেছিল যা নিছক স্থানীয় চাহিদার কারণে সৃষ্টি হয়নি। এই ধরনের দুটি প্রধান শিল্প হলো সরাসরি সুলতানদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা সরকারি কারখানা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত বস্ত্র বয়ন-শিল্প। সরকারি কারখানাগুলোতে শাসক পরিবার ও উচ্চ অভিজাতদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের দ্রব্য তৈরি হতো। যেমন টুপি, ওড়না জুতো, ঘোড়ার রেকাব, চাদর ইত্যাদি। বিদেশী শাসকদের কাছে প্রেরণের জন্য নানা ধরনের উপহার সামগ্রীও এখানে তৈরি হতো। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বস্ত্রবয়ন শিল্পের দুটি অগ্রণী অঞ্চল ছিল গুজরাট ও বাংলা। বাংলার সুতিবস্ত্রের খ্যাতি ছিল জগৎ জোড়া।

সুলতানি আমলে বস্ত্র-শিল্পের পরেই ছিল ধাতু-শিল্পের স্থান। ধাতু শিল্পীরা নানা ধরনের ধাতু যেমন- লোহা, তামা, রূপা, দস্তা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। চামড়া শিল্পেও এই যুগের শিল্পীরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন।

সুলতানি যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটায় ও রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা সাধিত হওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। এ যুগে বাংলা ও গুজরাটই ছিল প্রধান শিল্পাঞ্চল। কারণ, এ দুটি প্রদেশেই জাহাজযোগে নদীপথে পণ্য আমদানী-রপ্তানির সুবিধা ছিল। সুলতানি আমলের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, উপকূল বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায়। এই আমলের বাণিজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যুক্ত ছিল। তবে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গুজরাটি, মাড়োয়ারী, মুলতানি, খোরাসানি প্রমুখ ব্যবসায়ীদের জোরালো অবস্থান ছিল।

সুলতানি আমলে ব্যবসার প্রধান আকর্ষণ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য এবং এই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রগুলো ছিল উপকূল অঞ্চলে। বিদেশীদের বিবরণী হতে জানা যায় যে, দেশের পশ্চিম উপকূল বহু ব্যস্ত বন্দর ছিল। এগুলোর মধ্যে দিউ, গোয়া, কালিকট, কোচিন, কুইলন ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের উপকূল বাণিজ্যে গুজরাটি ও মালাবারী ব্যবসায়ীরা সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতো। সুলতানি আমলে ব্যাপক সামুদ্রিক বাণিজ্য চলতো। সামুদ্রিক বাণিজ্যপথেরও বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। পূর্বে প্রচলিত দুটি মাত্র সমুদ্রপথ সুলতানি আমলেও ব্যবহৃত হতো। একটি পথে পশ্চিম ভারতীয় উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে মেসোপটেমিয়ার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর যাওয়া যেতো। এবং অন্যটি ছিল লোহিত সাগর এবং মিশরের মধ্যদিয়ে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত। সেখান থেকে ভেনেসিয় ও অন্যান্য ইতালিয় বণিকদের মাধ্যমে পণ্য পশ্চিম ইউরোপ ছড়িয়ে পড়তো। ভারতীয়, ইউরোপীয়সহ অন্যান্য অঞ্চলের বণিকগণ এই বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতো।

সারসংক্ষেপ

সুপ্রাচীনকাল থেকে বহমান ভারতবর্ষের সমন্বয়ধারা সুলতানি আমলেও অব্যাহত ছিল। এ আমলে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে মাত্রায় সংমিশ্রণের ঘটনা ঘটেছে তা রীতিমতো দৃষ্টান্তমূলক। উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শিল্পে, কারুকার্যে, সৌধ নির্মাণে, সাহিত্যে, খানাপিনাতে, সামাজিকতায় এমনকি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও নবরূপ বিকশিত হয়, যার মধ্যে একান্তভাবেই 'ভারতীয়' বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রূপ সহজেই প্রতীয়মান হয়। কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিকভাবে সুবিন্যস্ত ও স্তরীভূত শাসন কাঠামো রচিত হয়। কৃষিই ছিল রাজস্বের প্রধান উৎস। এ আমলে নানা রকমের কর আদায়ের দৃষ্টান্ত রয়েছে। সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক জীবন সচ্ছল ছিল বলে মনে হলেও কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে কৃষকরা সম্ভবত শান্তিতে ও নিরুদ্বেগে তাদের পেশায় নিয়োজিত হতে পেরেছিলেন। সুলতানি আমলে ভারত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, উপকূল বাণিজ্য ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে বেশ অগ্রগতি সাধন করে। কৃষির পাশাপাশি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধিও ছিল উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুলতানি আমলের শাসনব্যবস্থার চরিত্র ছিল–
(ক) স্বৈরতান্ত্রিক (খ) গণতান্ত্রিক
(গ) প্রজাতান্ত্রিক (ঘ) ধর্মভিত্তিক।

২। 'দিওয়ান-ই-রিসালাৎ' অর্থ কি?
(ক) ডাক বিভাগ (খ) বিচার বিভাগ
(গ) আপীল বিভাগ (ঘ) পেনশন বিভাগ।

৩। 'শিক' চালু হয় কার আমলে?
(ক) আলাউদ্দিন খলজী (খ) মুহাম্মদ বিন তুঘলক
(ক) ফিরোজ শাহ তুঘলক (ঘ) বলবন।

৪। কে পরগণার কর্মচারী নন?
(ক) কারকুন (খ) কানুনগো
(গ) মুশরিক (ঘ) ওয়ালি।

৫। ব্রাহ্মণদের ওপরও জিজিয়া কর আরোপ করা হয় কার আমলে?
(ক) ফিরোজ শাহ তুঘলকের আমলে (খ) মুহাম্মদ বিন তুঘলকের আমলে
(গ) আলাউদ্দিন খলজীর আমলে (ঘ) ইলতুৎমিশের আমলে।

৬। কোন পর্যটক সূত্রে জানা যায়, বসন্তকালীন ফসলকে 'রবি' বলা হতো?
(ক) মা-হুয়ান (খ) বারবোসা
(গ) ইবনে বতুতা (ঘ) টোমে পিরেজ।

৭। সুলতানি আমলের প্রধান শিল্প পণ্য কোনটি?
(ক) বস্ত্র (খ) নৌকা নির্মাণ
(গ) পাটজাত সামগ্রী (ঘ) চর্ম শিল্পপণ্য।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সুলতানি শাসনব্যবস্থায় উজির-এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
২। সুলতানি আমলের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সুলতানি আমলে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় প্রচেষ্টা আলোচনা করুন।
২। সুলতানি আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবস্থা কিরূপ ছিল? এ আমলের রাজস্ব প্রথার ওপর আপনার মন্তব্য পেশ করুন।
৩। সুলতানি যুগের শাসন পদ্ধতির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন। এ ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। Ishwari Prasad, *A Short History of Muslim Rule in India.*
২। K.S. Lal, *History of the Khaljis.*
৩। Raychowdhury and others, *An Advanced History of India.*
৪। এ.কে.এম. আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম শাসনব্যবস্থার ইতিহাস।*
৫। প্রভাতাংশু মাইতী, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা।*
৬। Ishwari Prasad, *Medieval India.*

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর ঃ

পাঠ : ১ ১। (গ) ; ২। (খ) ; ৩। (গ) ; ৪। (ক)।
পাঠ : ২ ১। (গ) ; ২। (ক) ; ৩। (গ) ; ৪। (ঘ)।
পাঠ : ৩ ১। (খ) ; ২। (ঘ) ; ৩। (গ) ; ৪। (ক) ; ৫। (ক) ; ৬। (ক)।

পাঠ : ৪ ১। (খ) ; ২। (ঘ) ; ৩। (ক) ; ৪। (খ) ; ৫। (ক)।
পাঠ : ৫ ১। (ক) ; ২। (গ) ; ৩। (ক) ; ৪। (গ) ; ৫। (ঘ)।
পাঠ : ৬ ১। (ক) ; ২। (গ) ; ৩। (খ) ; ৪। (ঘ) ; ৫। (ক) ; ৬। (গ) ; ৭। (ক)।